9 788172 159672

ভাঙা ডানার পাখি • সুচিত্রা ভট্টাচার্য

কিশোর কাহিনী সিরিজ

ভাঙা ডানার পাখি

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

boiRboi.net

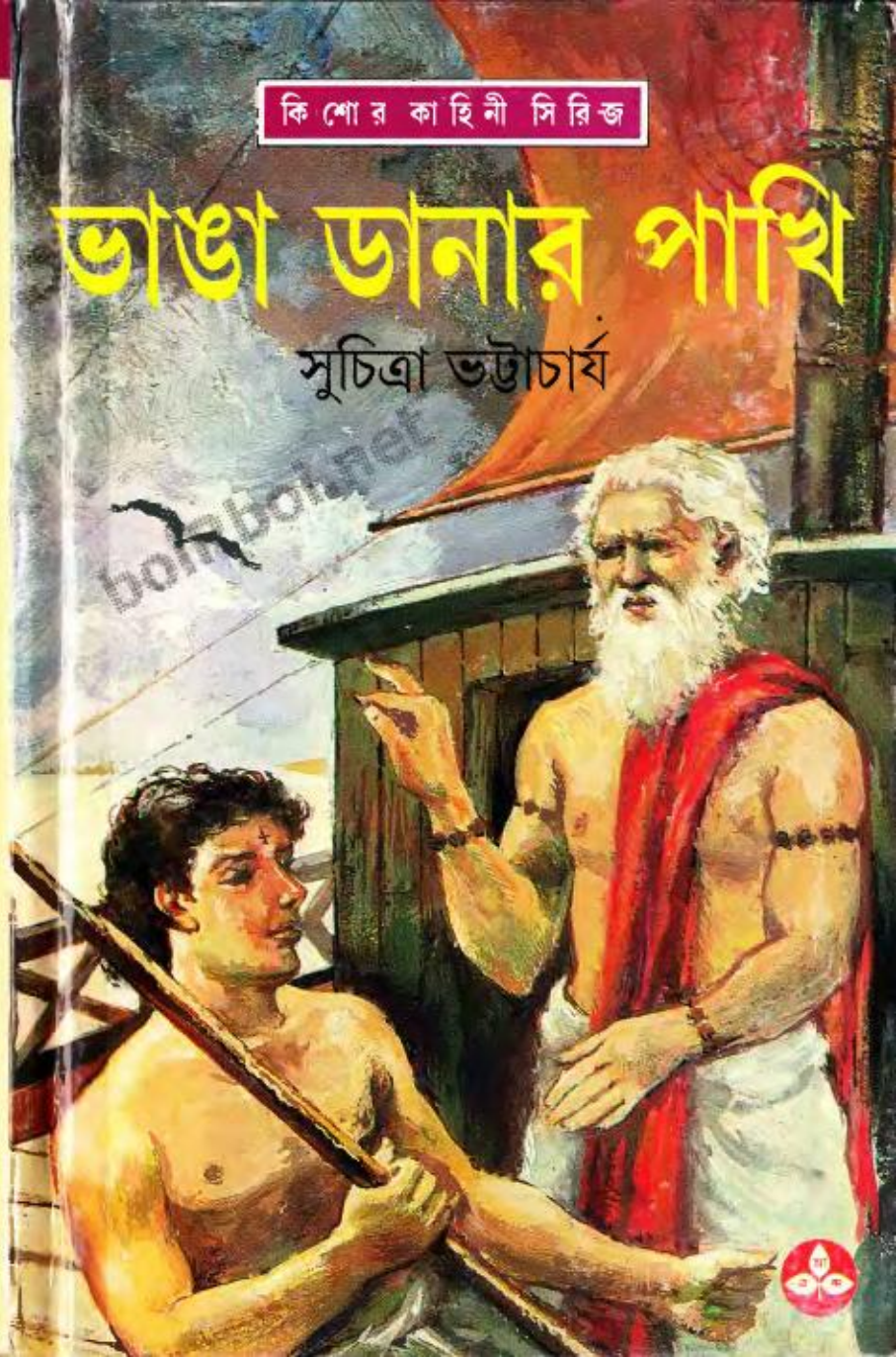

ভাঙা ডানার পাখি

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

অর্কপ্রভ দত্তগুপ্ত
বই নং 732
তারিখ 07 MAY 2009
ফোন 94743-89235
অরুণেন্দু ভবন, শিলিগুড়ি

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: নির্মলেন্দু মণ্ডল

boiRboi.net

আনন্দ

প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ১৯৯৯
দ্বিতীয় মুদ্রণ এপ্রিল ২০০৭

© সুচিত্রা ভট্টাচার্য

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনও রূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 81-7215-967-6

boiRboi.net

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুধীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা ৭০০০০৯
থেকে মুদ্রিত।

৮০.০০

আমার আদরের ভাইঝি
শ্রেয়সী ভট্টাচার্য
ও
দেবাঙ্গনা ভট্টাচার্যকে

boiRboi.net

732
07 MAY 2009

অনেক অনেক কাল আগের কথা। তা প্রায় আটশো সাড়ে আটশো বছর হবে। বাংলার পাল রাজাদের তখন ধিকিধিকি দশা, রাজা গোবিন্দপাল গৌড়ের সিংহাসনে টলমল-টলমল করছেন। কর্ণাটকের চালুক্যদের বারবার আক্রমণে আর গাহড়ওয়াল রাজ্যের সঙ্গে ঘন-ঘন যুদ্ধে পালসাম্রাজ্যের একেবারে ছিন্নভিন্ন। সঙ্গে গোদের ওপর বিষফোড়া, অধীনস্থ সামন্তরা কেউ আর রাজাকে তেমন মানে না, যে যখন যেদিকে পারছে নিজের পতাকা উড়িয়ে দিচ্ছে। বিদ্রোহ দমন করতে চারদিকে যে সেনা পাঠাবেন গোবিন্দপালের সে ক্ষমতাও আর নেই।

বাংলায় তখন সেনরাজাদের প্রবল প্রতাপ। হেমন্তসেন বিজয়সেনের পর রাজা হয়েছেন বল্লালসেন। রাজা রামপালের সাজানোগোছানো বিক্রমপুর নগরই তখন তাঁর রাজধানী।

তা বল্লালসেনের মনেও শান্তি নেই। বাংলার প্রায় পুরোটাই এখন সেনবংশের দখলে। পুণ্ড্রবর্ধন, বঙ্গ, রাঢ়, সমতট, কজঙ্গল সবই। শুধু গৌড় এখনও তাঁদের মুঠোর বাইরে। বল্লালসেনের বাবা বিজয়সেনের সঙ্গে পালরাজ মদনপালের জোর লড়াই হয়েছিল কালিন্দী নদীর তীরে। সে এক অদ্ভুত যুদ্ধ।

বিজয়সেনের দাবি বিজয়সেন জিতেছেন, মদনপালের দাবি তিনিই বিজয়ী। অর্থাৎ ফল সমান সমান। বল্লালসেনও রাজা হওয়ার পর তিন-তিনটে বছর কেটে গেল, খুচখাচ যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই আছে, কিছুতেই গৌড়ের দিকে ছোটার সময় পাননি তিনি। এখন অবস্থা মোটামুটি শান্ত, এবার গৌড় তাঁর চাইই। নামের আগে গৌড়েশ্বর না লিখতে পারলে বল্লালসেনের জীবনই বৃথা।

এই কাহিনী সেই সময়ের। তবে বল্লালসেনের নয়, তাঁরই রাজত্বের এক বণিকপুত্রের।

নাম তার অরুণাশ্ব।

কারাগারের বন্ধ কুঠুরিতে বসে একদৃষ্টে আলোটাকে দেখছিল অরুণাশ্ব। আলো নয়, সরু একফালি রোদ্দুর। পাথরের এই ছোট্ট ঘরখানায় একটাই মাত্র ফোকর, সেখান দিয়েই রোজকার মতো এসে পড়েছে লম্বাটে রোদ। ভোরবেলা এই রশ্মিটুকু অনেকটা দূরে থাকে, ওই লোহার মোটা-মোটা গরাদের মাথায়। বেলা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে আলোর রেখা পিছিয়ে আসতে থাকে পায়ে-পায়ে। সূর্য যত ওপরে ওঠে তত কাছে আসে আলো, দুপুর হলেই টুক করে কোথায় মিলিয়ে যায়। আঁধার নামে, ক্রমে আঁধার গাঢ় থেকে আরও গাঢ় হয়, একসময়ে গোটা কুঠুরি নিকষ কালো।

ওই আলো আর আঁধার দেখেই দিন-রাত্রির হিসেব কষে অরুণাশ্ব। প্রহর গোনে।

আজ এখন সূর্যরশ্মিটা ঘরের ঠিক মাঝখানে। অরুণাশ্ব মনে মনে ছটফট করে উঠল। কখন সকাল ফুটে গেছে, এখনও কেউ তাকে ডাকতে আসে না কেন ? আজই না তার বিচারের দিন !

মনের উত্তেজনা মনেই রেখে অরুণাশ্ব উঠে দাঁড়াল। উনিশ বছরের তরতাজা শরীরটায় পনেরো দিনেই মরচে পড়ে গেছে, তবু তাকেই ধনুকের মতো বাঁকাল বারকয়েক। রাতদিন ঠাণ্ডা মেঝেয় শুয়ে-বসে থেকে হাত-পায়ে খিল ধরে গেছে, ওঠ-বোস করে হাঁটু-কোমর ছাড়ানোর চেষ্টা করল। পায়চারি করছে। একচিলতে কুঠুরিতে পাঁচ পা'ও শান্তিতে হাঁটা যায় না, দেওয়াল পথ আটকে দাঁড়ায়, ফিরতে হয় বারবার। একটুক্ষণ হেঁটেই ক্লান্তি বোধ করল অরুণাশ্ব। থামল। ওই আলোর দিকেই খালি চোখ চলে যাচ্ছে, মনে পড়ে যাচ্ছে মার কথা। কী করছেন এখন মা ? অরুণাশ্বর কথা ভেবে মা কি কাঁদেন খুব ? না কি বাবার শোকে এখনও মা পাথর ?

এতক্ষণে আসছে প্রতিহার। বাইরে ছপ ছপ জুতোর আওয়াজ। অরুণাশ্ব দৌড়ে গিয়ে গরাদ আঁকড়ে ধরল।

প্রকাণ্ড চেহারার প্রতিহারের এক হাতে বল্লম, অন্য হাতে চাবির গোছা। গম্ভীর স্বরে প্রতিহার জিজ্ঞেস করল, "যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ?"

"প্রস্তুত।"

"খাওয়াদাওয়া সেরে নিয়েছ ?"

মেঝেয় পড়ে থাকা বাসী ফলপাকুড়ের দিকে একবার তাকিয়ে নিল অরুণাশ্ব। কারাগারে হবিষ্যির বন্দোবস্ত নেই, ওই ফলমূলই রোজ জুটছে। কাঁহাতক আর মুখে রোচে।

বিষণ্ণ স্বরে বলল, "হ্যাঁ, হয়ে গেছে।"

ঝনঝন শব্দ করে দরজা খুলছে প্রতিহার। মাটিতে লুটোপুটি

BoiRboi.net

খাওয়া মলিন উত্তরীয়খানা গায়ে জড়াতে গিয়েও জড়াল না অরুণাশ্ব। কুঠুরির বাইরে পা রাখতেই তার হাত দুটো পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলেছে প্রতিহার। টানছে। মুহূর্তের জন্য একটা রাগ ফুঁসে উঠল অরুণাশ্বর শরীরে, অনেক কষ্টে সামলাল নিজেকে। কী আর করা যাবে, বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে তো অপরাধীই।

কারাগারের বাইরে পা রাখতেই অরুণাশ্বর চোখ ধাঁধিয়ে গেল। যেন মাত্র পনেরো দিন পরে নয়, জীবনে এই প্রথম খোলা আকাশ দেখছে। এখনও দুপুর হয়নি, এর মধ্যেই বৈশাখের সূর্য গনগন আঁচ ছড়াচ্ছে, তাপে চামড়া পুড়ে যায়। বাতাস বইছে এলোমেলো। সেও ভারী গরম, একেবারে আগুনের হল্‌কা।

আরও দু'জন প্রতিহার এসে গেছে। প্রথম প্রতিহার তাদের হাতে সঁপে দিল অরুণাশ্বকে।

একজন হেঁকে উঠল, "চলো, চলো, মহাধর্মাধ্যক্ষ বিচারে বসে গেছেন। সাক্ষীসাবুদরাও সব হাজির। আজই মহাধর্মাধ্যক্ষ বিচার শেষ করতে চান।"

অরুণাশ্বর মুখ জ্বলজ্বল করে উঠল, "কে, কে এসেছেন ভাই? আমার কাকা এসেছেন কি?"

"অতশত জানিনে বাপু। গেলেই দেখতে পাবে।"

সামনে চওড়া পথ। দু'ধারে সারসার রাজকর্মচারীদের বাড়ি। বেশিরভাগই একতলা, একটা-দুটো দোতলাও আছে। অনেক বাড়িরই গবাক্ষ থেকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে বউঝিরা, কৌতূহলী চোখে দেখছে হাতবাঁধা অরুণাশ্বকে। ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছে পথচলতি পুরবাসীরাও। কারও চোখে সহানুভূতি, কারও চোখে বিস্ময়, কারুর চোখে ঘৃণা। দুঃখে, লজ্জায়, অপমানে অরুণাশ্বর মাথা হেঁট। চোখ না তুলে হাঁটছে। টগবগ ঘোড়া ছুটিয়ে রাজদূত

BanglaBook.net

চিত্রবর্মা বল্লালসেনের প্রাসাদের দিকে চলে গেলেন। ধুলোয়-ধুলোয় ঢেকে গেল রাজপথ।

হঠাৎ দূরে রব উঠেছে, "রাস্তা ছাড়ো, রাস্তা ছাড়ো, রানিমা আসছেন।"

সন্ত্রস্ত দুই প্রতিহার অরুণাশ্বকে চেপে ধরে একপাশে সরে দাঁড়াল। পুরবাসীরাও তড়িঘড়ি সরে যাচ্ছে পথ ছেড়ে। গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে।

কে একজন বলে উঠল, "রানিমা আজ এত দেরিতে ফিরছেন যে?"

"বা রে, আজ পুণ্যস্নান ছিল না! তারপর শিবমন্দিরে পুজো সেরে....."

"ও, তাই আজ শিবমন্দিরে এত ভিড়!"

"হ্যাঁ, ইনি মহারানি হওয়ার পর থেকে শিবঠাকুরের কপাল খুলে গেছে। দেখছিস না, মন্দিরের এখন কী জলুস!"

কথার ফাঁকেই চার পদাতিক সৈন্যকে আগে রেখে এসে গেছে রাজমহিষী রামদেবীর সুসজ্জিত পাল্‌কি। অরুণাশ্বদের পার হয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল।

শিবিকার পরদা সরিয়ে মুখ বাড়িয়েছে এক দাসী, "অ্যাই, রানিমা জানতে চাইছেন ওই ছেলেটি কে?"

দুই প্রতিহার সঙ্গে-সঙ্গে টানটান। একজন সসম্ভ্রমে উত্তর দিল, "আজ্ঞে, এ হল গিয়ে সুবর্ণগ্রামের জয়ানন্দ বণিকের ছেলে অরুণাশ্ব।"

"ও। তা একে তোমরা বেঁধে নিয়ে যাচ্ছ কেন?"

"আজ এর বিচার হবে।"

"কেন, কী করেছে এ?"

"আজ্ঞে, এ নিজের বাবাকে মেরে ফেলেছে।"

boiRboi.net

"সে কী গো, এমন ফুলের মতো সুন্দর ছেলে বাবাকে মেরেছে ?"

"আজ্ঞে, সেরকমই তো অভিযোগ আছে।"

অরুণাশ্ব আর চুপ থাকতে পারল না। কাতরভাবে বলে উঠল, "এ মিথ্যে অভিযোগ। আমি বাবাকে মারিনি। আমার বাবাকে আমি ভীষণ ভালবাসতাম। রাজামশাইয়ের লোকরা আমায় মিছিমিছি ধরে এনেছে।"

এক প্রতিহার ধমকে উঠল, "অ্যাই, তোমার সাহস তো কম নয় ! রানিমার সামনে তুমি রাজামশাইয়ের দোষ ধরো !"

"দোষ তো ধরিনি। সত্যি কথা বলছিলাম।"

"চোপ, একটা কথাও নয়। যা বলার মহাধর্মাধ্যক্ষর সামনে বলবে।"

এতক্ষণে রানিমার মুখ দেখা গেল। বহুকাল যুবরানি থাকার পর সবে তিন বছর হল তিনি মহারানি হয়েছেন, বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। মুখে তাঁর ভারী স্নিগ্ধ একটা মা মা ভাব আছে, দেখলেই প্রাণ জুড়িয়ে যায়।"

অরুণাশ্ব হাউমাউ কেঁদে উঠল, "বিশ্বাস করুন রানিমা, আমি বাবাকে মারিনি। আপনি আমায় বাঁচান রানিমা।"

রামদেবী বুঝি একটু ফাঁপরে পড়ে গেলেন। ছেলেটির নিষ্পাপ মুখ দেখে তাঁর মায়া হচ্ছে বটে, কিন্তু কিছু করার নেই। তাঁর স্বামী বল্লালসেন রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন, বিচারে যা হওয়ার তাই হবে। রাজপরিবারের কারও তাতে নাক গলানোর অধিকার নেই, এমনকী মহারানিরও না। তা ছাড়া তিনি নিজেও আরেক রাজবংশের মেয়ে। কর্ণাটরাজ দ্বিতীয় জগদেকমল্লের কন্যা। ছেলেবেলা থেকেই তিনি দেখে আসছেন রাজ্য শাসনে দয়া-মায়ার স্থান নেই।

boiRboi.net

তবু তাঁর টানা-টানা চোখ করুণায় ভরে গেল। নরম স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "বাড়িতে তোমার আর কে আছেন বাছা ?"

"মা আছেন, কাকা আছেন, কাকিমা আছেন...."

"ভাই-বোন নেই ?"

"দিদি আছে। বিয়ে হয়ে গেছে। সেই সোমপুরে।" অরুণাশ্ব ঢোক গিলল, "কাকার ছেলেমেয়েরাও আছে, তবে ছোট-ছোট।"

"ও, তার মানে তুমিই তোমার মা'র একমাত্র অবলম্বন ?"

"হ্যাঁ রানিমা। সেইজন্যই তো.....বলছিলাম....."

হাতের ইশারায় অরুণাশ্বকে চুপ করতে বললেন রামদেবী। ইঙ্গিতে কী যেন কথা হল দাসীর সঙ্গে।

দাসী হুকুমের স্বরে প্রতিহারকে বলল, "রানিমা বলছেন বিচারে ছেলেটির কী হল তা যেন রানিমাকে জানানো হয়।"

প্রতিহার ঘাড় নাড়ল, "যে আজ্ঞে রানিমা।"

"আজই।"

"যে আজ্ঞে।"

শিবিকা চলতে শুরু করল। আট হাট্টাকাট্টা জোয়ান পাল্‌কি কাঁধে মিলিয়ে গেল দূরে।

অরুণাশ্বর বুকটা হঠাৎ হু হু করে উঠল। চোখের সামনে ভেসে উঠছে, বাবার প্রাণহীন মুখ। ভোরবেলা দিঘির পাড়ে পড়ে আছেন বাবা, বুকে গেঁথে আছে বাঁকানো খঞ্জর, রক্তে ভেসে যাচ্ছে বাবার দেহ। কে অমন নিষ্ঠুরের মতো ছুরি মেরেছিল বাবাকে ? কে ? আশ্চর্য, কেন অরুণাশ্বর ঘাড়েই বা চেপে গেল পিতৃহত্যার দায় ? তাকে যখন ধরে নিয়ে আসছিল তখন বাড়ির লোকজনই বা কেন কিছু বলল না রাজকর্মচারীদের ? কেউ কেন বাধা দিল না ? কেন কেউ বলল না, অরুণাশ্ব এ-কাজ করতেই পারে না ? অরুণাশ্বর মা পর্যন্ত কেমন বাক্যহারা হয়ে ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে

boiRboi.net

ছিলেন ! ইশ, কাকা যদি সে-সময়ে বাড়ি থাকতেন !

অরুণাশ্ব মনকে শক্ত করল। রানিমার মুখ দেখে মনে হয় তিনি অরুণাশ্বর কথা বিশ্বাস করেছেন। তা হলে নিশ্চয়ই মহাধর্মাধ্যক্ষও তার কথা অবিশ্বাস করবেন না। প্রতিহাররা বলাবলি করছিল মহাধর্মাধ্যক্ষ ধনঞ্জয় খুবই বিজ্ঞ বিচারক, সত্য-মিথ্যার প্রভেদ তিনি নিখুঁতভাবে চিনতে পারেন। কে না জানে, সত্যেরই জয় হয়। সুতরাং মুক্তি সে পাবেই।

চোয়ালে চোয়াল ঘষল অরুণাশ্ব। মুক্তি পাওয়ার পর তার প্রথম কাজই হবে বাবার হত্যাকারীকে খুঁজে বার করা। তাকে শাস্তি না দিতে পারলে অরুণাশ্বর বুকের আগুন নিভবে না।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর ঘণ্টাখানেক ঘুমোন রাজা বল্লালসেন, এটাই তাঁর একমাত্র বিলাস। ইছামতী আর ব্রহ্মপুত্রে ঘেরা এই বিক্রমপুরের বাতাসে এক অদ্ভুত আমেজ আছে, এই দিবানিদ্রাটুকু না হলে সারা বিকেল সন্ধে গা ম্যাজম্যাজ করে, কাজেকর্মে মন বসতে চায় না। বিশেষ করে এই গ্রীষ্মের সময়ে।

আজ রাজার ভোজনটিও একটু গুরুপাক হয়ে গেছে। আগে তাঁদের পরিবারে মাছ খাওয়ার চল ছিল না, বাবার আমল থেকে সে নিষেধ সম্পূর্ণ উঠে গেছে। রুই, পুঁটি, ইলিশ, মৃগেল, কই সব মাছই বল্লালসেনের খুব প্রিয়, বিশেষত ইলিশ মাছ। সেই ইলিশ মাছের তেল দিয়ে অনেকটা সুগন্ধি চালের ভাত খেয়েছেন রাজা, সঙ্গে সর্ষে-দেওয়া মাছ, আর সাতরকমের ব্যঞ্জন। শেষ পাতে আমদুধের পায়েস। তাঁর পাচকটির হাতের রান্নাও অতি সুস্বাদু। প্রবীণবয়স্ক রাজা লোভ সামলাতে পারেননি, ফলত খাওয়াদাওয়ার পরে শরীরটাও বড় আইঢাই করছিল।

ঘুম থেকে উঠেই শরীর একদম ফুরফুরে। গুপ্তকক্ষে

boiRboi.net

মন্ত্রণাসভা বসেছে, আছেন মহামন্ত্রী ত্রিবিক্রম শর্মা, আছেন রাজদূত চিত্রবর্মা, আছেন সেনাপতি ভাস্কর এবং ঝরঝরে মেজাজে রাজা স্বয়ং। চিত্রবর্মা খবর এনেছেন মিথিলা নাকি গৌড় আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, শুনেই ভাস্কর মহা উত্তেজিত, পারলে আজই তিনি সৈন্যবাহিনী নিয়ে গৌড়ের দিকে রওনা হয়ে যান।

ত্রিবিক্রম শর্মা বৃদ্ধ মানুষ, তাঁর মাথাটি অত্যন্ত ঠাণ্ডা। রাজা বল্লালসেনের শত্রুরা বলাবলি করে ত্রিবিক্রমের রক্ত নাকি সাপের চেয়েও শীতল। সেনাপতির ছেলেমানুষি দেখে হাসছেন তিনি।

হাসতে-হাসতেই বললেন, "তোমার ঘোড়া, হাতি আর নৌবাহিনী নিয়ে ক'দিনে তুমি গৌড় পৌঁছতে পারবে?"

ভাস্কর চটজলদি জবাব দিলেন, "বড়জোর তিন সপ্তাহ।"

"আর মিথিলা থেকে গৌড় আসতে সেনাবাহিনীর ক'দিন লাগবে?"

ভাস্কর থতমত মুখে একটুক্ষণ ভাবলেন। বললেন, "পাঁচ-ছ'দিন।"

"মেরেকেটে এক সপ্তাহ, তাই তো?"

"তা হবে। আমাদের এদিককার পথ তো অনেক বেশি দুর্গম। নদীর জোয়ারভাটার ব্যাপার আছে, পথে জঙ্গলটঙ্গল পার হতে হয়, এই নদীনালার দেশ থেকে ওখানে পৌঁছনো কি মুখের কথা!"

"ঠিক।" ত্রিবিক্রম মাথা দোলালেন, "তার মানে মিথিলা যদি এখনই গৌড়ের দিকে রওনা হয়ে থাকে, তুমি কিছুতেই তার আগে গৌড়ে পৌঁছতে পারছ না।"

"তা পারব না।"

"তা হলে তোমার এত উতলা হয়ে লাভ নেই। স্থির হয়ে বসে আমি যা বলছি শোনো।" বলেই ত্রিবিক্রম কেশহীন শীর্ণ মাথাটি

boiRboi.net

রাজা বল্লালসেনের দিকে ঘোরালেন, "মহারাজ, আমার অন্য পরামর্শ ছিল।"

বল্লালসেন সোজা হয়ে বসলেন, "বলুন।"

আমার মনে হয় আপনার এই মুহূর্তে গৌড় আক্রমণ যুক্তিযুক্ত হবে না।"

"কেন?"

"কারণ এই মুহূর্তে আপনার হাতির সংখ্যা বেশি নয়। আর রাজা গোবিন্দপালের সৈন্যসামন্তের যত খারাপই দশা হোক না কেন, হাতির সংখ্যায় তিনি অনেক এগিয়ে আছেন। যুদ্ধ যদি আপনি জেতেনও, আপনার যে পরিমাণ সৈন্যক্ষয় হবে, তা নিয়ে আপনি গৌড়ের সিংহাসনে বসে থাকতে পারবেন না। ওই মিথিলার রাজাই আপনার বিপদের কারণ হয়ে উঠবে। গৌড়ের সামন্তরাও এখন যথেষ্ট শক্তিধর, বিশেষত চম্পার সামন্ত। এরা কিন্তু আপনাকে অহরহ বিব্রত করবে।"

বল্লালসেন অধৈর্য ভাবে বললেন, "তা হলে আমি এখন হাত পা গুটিয়ে বসে থাকব?"

"মোটেই না। আপনাকে এখনই হস্তীবল বাড়াতে হবে। তার জন্য আমি কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও চিন্তা করেছি।"

"যেমন?"

"অবিলম্বে পুণ্ড্রবর্ধন আর কজঙ্গলে লোক পাঠানোর কথা ভেবেছি। দু' জায়গাতেই জঙ্গলে হাতি আছে, খেদা পেতে হাতি ধরার লোকও আছে আমাদের। ইতিমধ্যে আমরা সৈন্যসামন্ত নিয়ে দেওপাড়ায় চলে যাই, আর আপনি স্বয়ং কিছু সৈন্যবাহিনী নিয়ে পুণ্ড্রবর্ধনের মহাস্থানের প্রাসাদে গিয়ে অধিষ্ঠান করুন। মোটামুটি হস্তীবল তৈরি হয়ে গেলে যুবরাজ লক্ষ্মণসেন ভাস্করকে নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করতে পারবেন। তবে..."

boiRboi.net

"আবার তবেটা কী ?"

"তবে আমরা প্রথমেই গৌড় আক্রমণ করব না। সোজা আমরা চলে যাব মিথিলায়। যদি সম্ভব হয় তো মগধেও। মগধ আর মিথিলা যদি আমরা আগে জয় করে নিতে পারি, তা হলে তো গৌড় এমনিই আমাদের হাতে এসে যাবে। লাভের মধ্যে লাভ, তখন আর গৌড় সামলাতে আপনাকে সর্বদা উদ্বিগ্ন হয়ে থাকতে হবে না। আমার গুপ্তচরেরা খবর দিয়েছে মগধের রাজপরিবারে এখন জোর ঝগড়াঝাঁটি চলছে। আপনার সৈন্য ঢুকে পড়লে রাজভ্রাতা আপনার পক্ষে যোগ দিতে পারে। মুসলমানরা এখনও মগধের দিকে আসেনি, এটাই কিন্তু আমাদের মগধ জয়ের শ্রেষ্ঠ সময়।"

বল্লালসেন ঘাড় নাড়লেন। ত্রিবিক্রম শর্মার কথা ভারী যুক্তিপূর্ণ, কোনও বাক্‌বিতণ্ডাই চলে না। তবু মৃদু হেসে বললেন, "কিন্তু এখনই যদি মিথিলা গৌড় দখল করে নেয়..."

"নিক না। ভালই তো। তেমন হলে গৌড়ের বেশ কয়েকজন সামন্তকে আমরা দলে পেয়ে যাব।"

"আপনি নিশ্চিত ?"

"আমার মাথার চুল এমনি এমনি পড়ে যায়নি মহারাজ।" ত্রিবিক্রমও মিটিমিটি হাসছেন, "চিত্রবর্মাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন আমার অনুমান নির্ভুল কি না।"

boiRboi.net

চিত্রবর্মা কিছু বলার আগেই দরজায় মৃদু শব্দ শোনা গেল। বল্লালসেন বিরক্ত মুখে তাকালেন, "কে ? কে ওখানে ?"

ওপার থেকে জবাব এল, "আমি অর্কদাস। আপনার শিরোরক্ষক।"

দেহরক্ষী রাজাকে মন্ত্রণাসভা থেকে ডাকে কেন ! বল্লালসেনের গলা চড়ল, "কী চাই ?"

"মহারানি খবর পাঠিয়েছেন। এখনই আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।"

"এখন! হঠাৎ?"

"জানি না মহারাজ। শ্যামা বলছে মহারানি নাকি কী কারণে ভীষণ উতলা হয়ে পড়েছেন।"

বল্লালসেনের প্রৌঢ় কপালে বলিরেখা দেখা দিল। রামদেবী তো কখনও এমন অসময়ে ডাকেন না তাঁকে! একটু পরেই সন্ধ্যা আহ্নিক করতে অন্দরমহলে যাবেন তিনি, তখনই তো রামদেবী তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারতেন!

গুরুতর কিছু কি ঘটেছে অন্তঃপুরে!

রাজবাড়ির অন্দরমহল আর পাঁচটা দিনের মতোই এখন কলরবে মুখর। দক্ষিণের ফুলবাগানে যুবরাজ লক্ষ্মণসেনের দুই মেয়ে সখীদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে, তাদের হাসি আর উল্লাসে ভরপুর হয়ে আছে চারদিক। গ্রীষ্মের বিকেলে রোজই এ-সময়ে যুবরানি বল্লভা পদ্মসরোবরে সাঁতার কাটতে নামেন, সেখান থেকেও উড়ে আসছে টুকরো-টুকরো হাসি। অন্দরের কোনও ঘরে নূপুরের আওয়াজ, কোনও ঘরে বীণার টুংটাং, কোথাওবা শুধুই ঘরে ফেরা পাখিদের মতো কিচমিচ কিচমিচ ধ্বনি।

বল্লালসেন রীতিমত অবাক। বেশ তো চলছে সব, কোথাও কোনও তাল কেটেছে বলে তো মনে হয় না! মহারাজকে পথ ছেড়ে দিতে দালানের দু'পাশে সরে সরে দাঁড়াচ্ছে দাসীরা, তাদের

boiRboi.net

মুখেও তো কোনও মেঘ নেই!

তবে?

চিনা রেশমের পরদা সরিয়ে বল্লালসেন মহারানির শয়নকক্ষে ঢুকলেন। হাতির দাঁতের কারুকাজ-করা পালঙ্কে বসে আছেন রামদেবী, পায়ের কাছে তাঁর প্রধানা সহচরী শ্যামা, নিচু স্বরে কী যেন কথা চলছে দু'জনের। রাজাকে দেখেই শ্যামা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল, ঘোমটা টেনে তড়িঘড়ি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বল্লালসেন কোনও প্রশ্ন করার আগেই রামদেবী বলে উঠলেন, "মাপ করবেন মহারাজ, অসময়ে আপনাকে বিরক্ত না করে পারলাম না। আমার একটা গুরুতর অভিযোগ আছে।"

বল্লালসেন বিস্মিত চোখে তাকালেন, "অভিযোগ! কী অভিযোগ?"

"আপনি কথায়-কথায় বলেন ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা চান, ধর্মের প্রতিষ্ঠা চান। অথচ আপনারই রাজ্যে, আপনার চোখের সামনে একটা কত বড় অধর্ম ঘটে গেল তার খবর রাখেন?"

বল্লালসেনের ফরসা মুখ লাল হয়ে গেল, "কেন, কী হয়েছে? কোথাও কি কোনও ব্রাহ্মণের অপমান হয়েছে? পুজোয় বিঘ্ন ঘটেছে কোনও?

ব্রাহ্মণের অপমান আর পুজোয় বিঘ্ন ঘটাই কি আপনার রাজ্যে অধর্ম? রামদেবীর গোলগাল মুখখানা আরও ভারী হয়ে গেল, "জানেন, আজ একটা দুধের ছেলের বিনা অপরাধে প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়ে গেছে? কাল ভোরের আলো ফোটার আগেই আপনার জল্লাদেরা তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবে?"

রামদেবীর স্বর বুজে এল। ওড়নার খুঁটে চোখ মুছছেন। দু-এক পল রানিকে স্থির চোখে দেখলেন বল্লালসেন। তারপর পায়ে পায়ে পালঙ্কে গিয়ে বসেছেন। জরিদার উত্তরীয়খানি গা

boiRboi.net

থেকে খুলে বললেন, "তুমি কি সুবর্ণগ্রামের জয়ানন্দ বণিকের ছেলেটার কথা বলছ ?"

"আ-আপনি তবে জানেন !"

"জানি বইকি। মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হলে রাজাকে সঙ্গেসঙ্গে জানানো এ-রাজ্যের বিধি।" বল্লালসেনের স্বর গম্ভীর, "কিন্তু তুমি যাকে দুধের খোকা বলছ সে তো মোটেই তেমন নয়। যথেষ্ট সাবালক। আঠেরো পুরে গেছে। আর অপরাধও সে যা করেছে তাতে মৃত্যুদণ্ড ছাড়া অন্য কোনও শাস্তি হয় না। পিতৃহত্যা ব্রহ্মহত্যার চেয়েও গুরুতর অপরাধ।"

"কিন্তু বিচার তার ঠিক হয়নি মহারাজ।"

"এ তুমি কী বলছ রামদেবী ! সুবর্ণগ্রাম থেকে অন্তত আটজন সাক্ষী এসে বলে গেছে জয়ানন্দর সঙ্গে তার ছেলের সম্পর্ক খুব খারাপ ছিল। ছেলে যখন তখন বাবাকে মারবে বলে শাসাত। ...ছেলেটির কাকা, কী যেন নাম ? হ্যাঁ, নয়নাগ। সে তো ভাইপোর কুকীর্তির কথা বলতে গিয়ে বিচারকক্ষে আজ হাউহাউ করে কেঁদেছে..."

"না, না মহারাজ।" রামদেবী আকুল ভাবে মাথা নাড়লেন, "নিশ্চয়ই কোথাও কোনও ভুল হয়েছে। আজ সকালে শিবমন্দির থেকে ফেরার পথে আমি স্বচক্ষে ছেলেটিকে দেখেছি। অমন নিষ্পাপ যার মুখ সে কখনওই বাবাকে হত্যা করতে পারে না। আমি তার সঙ্গে কথা বলেও দেখেছি মহারাজ। কী ব্যাকুল মুখে সে আমার কাছে প্রাণভিক্ষা চাইছিল !"

"হুম।"

বল্লালসেন মনে মনে হাসলেন। রামদেবীর দয়ার প্রাণ, মুখ দেখেই ভুলে গেছেন। তাঁর মা বিলাসদেবীও ঠিক এমনটাই ছিলেন। এই নিয়ে বাবা বিজয়সেনকে কম অশান্তি পোহাতে

boiRboi.net

হয়নি। একবার এক বৌদ্ধ নাস্তিক পাষণ্ডকে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের অপমান করার জন্য হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন বাবা, বিলাসদেবীর কাতর অনুনয়ে শেষ পর্যন্ত বাবাকে সে আদেশ রদ করতে হয়েছিল। ব্রাহ্মণরা সেই কারণে ক্ষুব্ধও হয়েছিলেন খুব। শেষে ভূমিদান করে কোনওক্রমে তাঁদের ঠাণ্ডা করা হয়েছিল। রামদেবীও যুবরানি থাকার সময় থেকে অকাতরে দানধ্যান করে যাচ্ছেন, গরিবদুঃখী দেখলেই বস্ত্র বিলোচ্ছেন, আহার বিলোচ্ছেন। রানি হওয়ার পরে সে স্বভাব উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। তা সে যাক, দানধ্যান তবু পুণ্যের কাজ। তা বলে রাজ্যশাসনে মাথা গলানো কেন? মুখ দেখেই যদি দোষী নির্দোষ সব চেনা যেত তবে তো বিচারব্যবস্থা থাকার আর দরকারই হত না।

রামদেবী খপ করে বল্লালসেনের হাত চেপে ধরেছেন, "মহারাজ, আপনার মহাধর্মাধ্যক্ষের বিচারে তো ভুলও হতে পারে।"

বল্লালসেন একটু রূঢ় হলেন, "না, হতে পারে না। হলেও আমার কিছু করার নেই। ধনঞ্জয়কে আমি যখন মহাধর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেছিলাম তখনই তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে তাঁর বিচারে আমিও কখনও হস্তক্ষেপ করব না। তিনি খুব আত্মাভিমানী মানুষ, তাঁর বিচার নিয়ে সংশয় প্রকাশ করলে তিনি সঙ্গে-সঙ্গে পদত্যাগ করে চলে যাবেন। তাতে আমারও বদনাম হবে। আমি তা চাই না।"

"কিছুই কি করা যায় না মহারাজ? যাতে অন্তত ছেলেটা প্রাণে বেঁচে যায়? অন্য কোনও শাস্তি দিন। নির্বাসন... অঙ্গচ্ছেদ..."

"উপায় নেই। আমার নিজের নিয়ম আমি নিজে কী করে ভাঙি!"

"এ আপনার জেদের কথা।"

boiRboi.net

"না, এটা ন্যায়নীতির কথা।"

"আপনি তা হলে কিছুই করতে পারবেন না?"

"বললাম তো। উপায় নেই।" রামদেবীর হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিলেন বল্লালসেন। আপন মনে বললেন, "জানো রামদেবী, একশো বছরের ওপর হল আমরা এ-দেশে এসেছি, এখনও এখানকার মানুষ আমাদের ভিন্‌দেশি ভাবে। আমি একটা ভুল কাজ করলে, এমনকী তোমার কথা মতো যদি দয়াও দেখাই, কেউ সেটাকে সাদা চোখে দেখবে না। ধনঞ্জয়ের অপমানটাই

তাদের কাছে বড় হয়ে যাবে। পরিণামে রাজকর্মচারীরা অসন্তুষ্ট হতে পারে, সামন্তরা ক্ষুব্ধ হতে পারে..."

"থাক, থাক, বুঝেছি।" রামদেবী উঠে গবাক্ষের কাছে চলে গেলেন। বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "একটা বাচ্চা ছেলে, আপনার নাতি বিশ্বরূপের বয়সী, সে যদি একটা অন্যায় করেও থাকে, তাকে বেঁচে থাকার সুযোগটুকুও দেবেন না

অর্কপ্রভ দত্তগুপ্ত
733
বই নং
ভর্তির
ফোন
ফেরানোর তারিখ লিখিবার জন্য
- 7 MAY 009

আপনারা ? যদি সে বাবাকে মেরে ফেলেও থাকে, বেঁচে থেকেই নয় তার সাজা ভোগ করুক।" বলতে বলতে হঠাৎই রামদেবীর স্বর তীক্ষ্ণ হল, "আমি আপনার কাছে কোনওদিন কিছু প্রার্থনা করিনি মহারাজ। আপনাদের এই রাজবংশের যে-কোনও বিপদে প্রাণপণে সাহায্য করেছি। মনে পড়ে, কলিঙ্গরাজের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে আমি বাবার কাছ থেকে দু'হাজার অশ্বারোহী আনিয়ে দিয়েছিলাম ? কেন আনিয়েছিলাম ? আপনার আর শ্বশুরমশাইয়ের মুখ রাখতে। ওই সৈনিকরা না থাকলে আপনারা সেবার কলিঙ্গ থেকে মাথা উঁচু করে ফিরতে পারতেন ? আজ একটাই অনুরোধ করছি..."

রামদেবীর কথায় বল্লালসেন চাপের গন্ধ পেলেন। তাঁর স্ত্রীটি শান্ত বটে, তবে তাঁকে মনে মনে তিনি একটু ভয়ই পান। হয়তো বা রাজবংশের মেয়ে বলেই।

আমতা আমতা হেসে বললেন, "তুমি হঠাৎ ওই বণিকের ছেলেটাকে বাঁচানোর জন্য এমন মরিয়া হয়ে উঠেছে কেন বলো তো ?"

"কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও অপরাধটা করেনি। তা ছাড়া..."

"কী তা ছাড়া ?"

"আমি ওর মধ্যে আমার সেই উনিশ বছরের লক্ষ্মণকে দেখতে পেয়েছি মহারাজ। সেই লম্বা শরীর, সেই চওড়া কাঁধ, ঝকঝকে চোখ, টকটকে রং..." বলতে বলতে জানলা থেকে সরে এলেন রামদেবী। ফিসফিস করে বললেন, "ওকে দেখার পর থেকে আমার যেন কী এক অনুভূতি হচ্ছে মহারাজ। খালি মনে হচ্ছে ওর কিছু হয়ে গেলে আমার লক্ষ্মণেরও অমঙ্গল ঘটবে। লক্ষ্মণ সেই কবে ব্যাঘ্রচটিতে শিকারে গেছে... আজও ফিরল না... দুপুরে তন্দ্রা মতন এসেছিল, একটা খারাপ স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল..."

pathagar.net

বল্লালসেনের বুকের ভেতরটা ধুকপুক করে উঠল। রামদেবীর এই মঙ্গল অমঙ্গলের পূর্ব অনুমান প্রায়ই ফলে যায়। সেবার লক্ষ্মণ হরিকেলে যুদ্ধ করতে গেল, রামদেবী স্বপ্ন দেখলেন লক্ষ্মণ যন্ত্রণায় ছটফট করছে। ক'দিন বাদেই খবর এল বর্শার খোঁচায় বেশ ভালমতন আহত হয়েছে লক্ষ্মণ। সোমপুরের প্রাসাদে হঠাৎ এক বিকেলে রামদেবী আর্তনাদ করে উঠলেন, কেশব জলে ডুবে যাচ্ছে! সত্যি সত্যি সেবার করতোয়া নদীতে নৌকো থেকে পড়ে গিয়েছিল ছোট নাতি কেশব সেন।

চিন্তিত মুখে বল্লালসেন বললেন, "তুমি আমাকে বিপদে ফেললে রামদেবী। কী করি বলো তো?"

রামদেবীর মলিন মুখ পলকে উজ্জ্বল, "ধনঞ্জয়ের সঙ্গে একবার কথা বলুন না।"

"তা হয় না। আমি তাঁকে চটাতে পারব না।"

"তা হলে হলায়ুধের সঙ্গে পরামর্শ করুন।"

হলায়ুধ ধনঞ্জয়ের ছোট ছেলে। লক্ষ্মণসেনের প্রাণের বন্ধু। অল্প বয়সেই বিস্তর শাস্ত্রজ্ঞান অর্জন করে সে এখন সেন বংশের রাজপণ্ডিত। কিন্তু হলায়ুধ তার বাবাকে চেনে এবং যমের মতো ভয় পায়। সে কি কোনও পথ বাতলাতে পারবে?

বল্লালসেন মাথা নাড়লেন, "উহুঁ, হলায়ুধকে দিয়ে হবে না। এ সব ছেলেছোকরাদের কম্মো নয়।"

"তা হলে ত্রিবিক্রম শর্মা?"

"লাভ নেই। কিশোর যুবকদের প্রাণের ওপর ত্রিবিক্রম শর্মার কোনও মায়া নেই। তিনি বড় নীরস মানুষ।"

উঠে দাঁড়িয়ে বল্লালসেন পায়চারি করছেন। তাঁর প্রৌঢ় কপাল কুঁচকে যাচ্ছে ঘন ঘন, চোখের মণি ঘুরছে। মখমলের টানা পাখা মাথার ওপর দুলছে জোরে জোরে, বিরক্ত মুখে সেদিকে তাকালেন

boiRboi.net

একবার। কী ভেবে গবাক্ষের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। এই জানলাটি দিয়ে বাইরেটা অনেক দূর অবধি দেখা যায়। সামনে নারকেল আর সুপুরি গাছের সারি, তার পরে পাঁচিল, তার ওপারে চূড়ায় সোনার কলস বসানো পর পর বাড়ি। সব কটা বাড়িই রাজার খুব নিকটজনদের, যাঁরা তাঁর সভায় উঁচু উঁচু পদে রয়েছেন। কেউ বা মন্ত্রী, কেউ কোটাল, কেউ বা কর সংগ্রহ করেন, কেউ রাজ্যের আয়-ব্যয়ের হিসেব দেখেন। সভাকবি সভাগায়কদের বাসও এখানেই। এঁদের মধ্যে একজনও কি নেই যিনি তাঁকে একটা বুদ্ধি দিতে পারেন ? যাতে সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে ?

হঠাৎই চড়াং করে বল্লালসেনের মাথায় ঝিলিক খেলে গেল। আছেন একজন। একজনই আছেন।

উত্তরীয় গায়ে জড়িয়ে রামদেবীর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন বল্লালসেন। দ্রুত পায়ে।

বিক্রমপুর নগরের উত্তরে ইছামতী, পুবে ব্রহ্মপুত্র। ইছামতী নদী যেখানে ব্রহ্মপুত্রে মিশেছে সে জায়গাটা ভারী সুন্দর। ওপারে যত দূর চোখ যায় ধানক্ষেত আর ধানক্ষেত, এপার ইয়া ইয়া গাছে ছয়লাপ। নিম, ঘোড়ানিম, শিরীষ, অশ্বত্থ। গাছগুলোর নীচে বেলে পাথরের বাঁধানো বেদি, সেখানে বসে সকাল সন্ধে নগরবাসীরা হাওয়া খায়।

কাছেই গুটি কয়েক কুটির। সাধুসন্ন্যাসীদের। সামনে চৈত্রসংক্রান্তি, গাজনের মেলা আসছে, খড়ে ছাওয়া মাটির কুটিরগুলোর এখন রমরমা দশা। আশ্রমে আশ্রমে ভিড় লেগেই আছে। শিবভক্তদের গাঁজার আসর চলছে জোর।

আর একটু দক্ষিণমুখো হাঁটলে ছোট্ট একখানা কাঠের বাড়ি।

boiRboi.net

একেবারে নির্জনে, ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে। শালবল্লার খুঁটির ওপর বাড়িটি মাটি থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে, সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়।

সন্ধে নেমেছে। বাড়িটার ভেতরঘরে রেড়ির তেলের পিদিম জ্বলছে। প্রদীপের মৃদু আলোয় মুখোমুখি বসে কথা বলছেন অনিরুদ্ধ আর জীমূতবাহন। অনিরুদ্ধর বয়স আশি পেরিয়ে গেছে, জীমূতবাহন পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি। অনিরুদ্ধ সেনরাজ্যের সেরা পণ্ডিত, রাজা বল্লালসেন তাঁর ছাত্র। জীমূতবাহনও পড়াশুনো নিয়ে থাকে, কিছুদিন আগে কালবিবেক বলে একটা বই লিখে পণ্ডিত সমাজে হইহই ফেলে দিয়েছে। এখন আইনকানুন বিচার নিয়ে আর একটা বই লেখার তোড়জোড় করছে সে, আর তাই নিয়েই আলোচনা করতে এসেছে অনিরুদ্ধর সঙ্গে।

অনিরুদ্ধ বলছিলেন, "তুমি তো ভারী অদ্ভুত পরিকল্পনা করেছ হে। এমন একটা বই লেখার তোমার ইচ্ছে হল কেন ?"

জীমূতবাহন তার ঝাবরি চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, "এর একটা ইতিহাস আছে আচার্য। গত বছর আমি দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম, তখন উত্তরে তক্ষশিলায় এক যবন পণ্ডিতের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তাঁর কাছে এক বিচিত্র জিনিস আমি জানতে পারি। ওঁদের এক ধর্মগ্রন্থ আছে, নাম তার আল-কুরান। সেই গ্রন্থে এক দিকে যেমন ধর্মের নির্দেশও আছে, তেমনই অন্য দিকে রাজ্যের আইনকানুন বিচার, কাকে কী শাস্তি দেওয়া হবে, কার সাক্ষ্য কতটা গ্রাহ্য হবে... সবই আছে। এমনকী সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা কীরকম হওয়া উচিত সে সম্পর্কেও বলা আছে। ওই গ্রন্থটি দেখেই আমার মনে হল আমাদের তো ঠিক এরকম কোনও গ্রন্থ নেই! আমাদের মুনি-ঋষিরা অনেক সময়ে অনেক নিয়মকানুনের কথা বলেছেন, কিন্তু একজনের সঙ্গে আর

একজনের মত মেলে না। তাই ভাবলাম বিভিন্ন ঋষিদের বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে সংগ্রহ করে, তার সঙ্গে নিজের যুক্তি বুদ্ধি মিশিয়ে যদি একটা সাধারণ আইনের বই রচনা করতে পারি... সে বিচার নিয়েই হোক, আর সম্পত্তির ভাগাভাগি নিয়েই হোক।

দূর থেকে ঘোড়ার খুরের শব্দ ভেসে আসছে। ক্রমশ কাছে আসছে শব্দ, আরও কাছে। জীমূতবাহন চুপ করে গেল। অনিরুদ্ধও কান পেতে শুনছেন শব্দটা। কে আসে! এই সময় এ পথ দিয়ে অশ্বারোহী তো বড় একটা যায় না!

শব্দ থেমেছে।

অনিরুদ্ধ কথায় ফিরলেন, 'কিন্তু তুমি আমার কাছে এসেছ কেন? তোমার গুরু আচার্য সোমদেবই তো তোমাকে এ-কাজে ভাল সাহায্য করতে পারেন।"

"এসেছি অন্য কারণে। মহারাজ বিজয়সেনের আমলে আপনি দীর্ঘদিন এ-রাজ্যের ধর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। আপনার অভিজ্ঞতার ভাঁড়ারটি বিশাল। আপনার সাহায্যও আমার প্রয়োজন।"

কাঠের সিঁড়িতে ভারী পায়ের আওয়াজ।

অনিরুদ্ধ গলা খাঁকারি দিলেন, "কে? কে ওখানে?"

দরজায় ছায়া পড়ল, "আমি গুরুদেব। বল্লালসেন।"

boiRboi.net

অনিরুদ্ধকে প্রণাম করে বল্লালসেন বললেন, "পরশুই জেনেছি আপনি বিক্রমপুরে এসেছেন। কাজে এমন ব্যস্ত ছিলাম, আপনার

দর্শনে আসতে একটু বিলম্ব ঘটে গেল।"

"তাতে কী ? এই তো এসেছ।" পলিতকেশ অনিরুদ্ধ হাত তুলে রাজাকে আশীর্বাদ করলেন, "বোসো।"

তালপাতার শীতলপাটিতে বসলেন বল্লালসেন। জীমূতবাহন শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, আড়চোখে রাজা তাকে দেখে নিলেন একবার। খুশি হলেন না। জীমূতবাহনকে তিনি চেনেন, তার লেখা কালবিবেক বইটিও তাঁর গ্রন্থাগারে আছে, পড়েওছেন তিনি। খুবই ভাল বই। সৌরমাস চান্দ্রমাসের হিসেব আছে বইটায়, কোন্‌টা কোন কাজের শুভ সময় অশুভ সময়, সুন্দর নির্ধারণ করেছে ছেলেটা। কিন্তু ছেলেটার একটা দোষও আছে। ছেলেটা থাকে লক্ষ্মণসেনের শ্বশুরবাড়ির দেশে, যুবরানি বল্লভার মহা দুষ্ট ভাই কুমারদত্ত এর বন্ধু। কুমারদত্তর কোনও বন্ধুকেই রাজা পছন্দ করেন না।

জীমূতবাহন মাথা ঝুঁকিয়ে সবিনয় বলে উঠল, "পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত অরিরাজ-নিঃশঙ্ক-শঙ্কর বল্লালসেনের জয় হোক।"

বল্লালসেন বিরক্ত মুখে বললেন, "আচার্যের গৃহে তাঁরই শিষ্যের জয়ধ্বনি করা উচিত নয়।"

জীমূতবাহন থতমত খেয়ে গেল।

রাজা একটু বাঁকা গলায় বললেন, "তুমি হঠাৎ বিক্রমপুরে ?"

"আজ্ঞে, আমি একটা নতুন গ্রন্থ রচনার কথা ভাবছি। হলায়ুধ মিশ্রের সঙ্গে সে বিষয়ে কিছু আলোচনা ছিল। আচার্য অনিরুদ্ধর কাছেও কিছু প্রয়োজন আছে। উনি বিক্রমপুরে এখন এসেছেন জেনে..."

"অ।"

বল্লালসেন তেমন উৎসাহ দেখালেন না। জীমূতবাহনকে

boiRboi.net

উপেক্ষা করে অনিরুদ্ধকে বললেন, "গুরুদেব, আপনার সঙ্গে একান্তে কথা বলতে চাই।"

ইঙ্গিত বুঝে জীমূতবাহন বাইরে চলে গেল।

বল্লালসেন এবার অনেকটা স্বচ্ছন্দ হলেন। কুশল প্রশ্নাদি শেষ করে খানিকটা ছেলেমানুষের ভঙ্গিতে বললেন, "আপনি কিন্তু আমায় খুব দুঃখ দিয়েছেন গুরুদেব। এবার আপনি আমার প্রাসাদে পায়ের ধুলো দ্যাননি।"

অনিরুদ্ধ মুখ টিপে হাসলেন, "বাবা বল্লাল, বানপ্রস্থে আছি। চম্পাহট্টে গঙ্গার পাড়ে থাকি এখন। এখানে এসেও আর নগরের মধ্যে ঢুকতে মন চায় না। এত দূর দেশে আসছি ভেবেই গায়ে জ্বর আসছিল! নেহাত নাতিনাতনিদের বেশিদিন না দেখলে মন উচাটন হয়, তাই মহেশ্বরের নাম করে বেরিয়ে পড়লাম। আমার এই কুটিরেই আমি বেশ আছি। আত্মীয় পরিজনরা আসছে, দেখা করে যাচ্ছে.... তা তুমি এভাবে একা চলে এলে যে বড়? তোমার শিরোরক্ষকরা কোথায়?"

"গুরুর কাছে সমস্ত অহং ত্যাগ করে আসাই শাস্ত্রের বিধান। দেহরক্ষীদের আমি নগরের উত্তর ফটকে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি।" বল্লালসেনের ঠোঁটেও হাসি। আরও নম্র স্বরে বললেন, "আমি আগের বার আপনাকে একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম। তাই নিয়ে কিছু ভাবনাচিন্তা করেছেন?"

"তোমার রাজ্যে মহাপুরোহিত হওয়ার? অসম্ভব বললাম না, আমি বানপ্রস্থে আছি।"

"তবু আরেকবার ভেবে দেখুন আচার্য। আপনি কাছাকাছি থাকলে আমি অনেক নিশ্চিন্ত বোধ করি।"

"রাজার মুখে এমন কথা মানায় না বল্লাল। শেষ জীবনটা আমায় একটু শান্তিতে শাস্ত্রে ডুবে থাকতে দাও। আমার হারলতা

boiRboi.net

গ্রন্থটি শেষ করার কাজে আমি এখন হাত দিয়েছি।"

বল্লালসেন ছোট্ট নিশ্বাস ফেললেন।

অনিরুদ্ধ পিঠ সোজা করলেন, "তুমি কি একান্তে আমায় এই কথাটিই বলতে এসেছিলে বল্লাল ? উঁহু। কাজের কথা বলো।"

তীক্ষ্ণবুদ্ধি গুরুকে চেনেন বল্লালসেন। আজেবাজে কথায় না গিয়ে জয়ানন্দ বণিকের ছেলের কাহিনীটি শোনালেন গুরুদেবকে। সঙ্গে রামদেবীর বায়নার কথাও।

অনিরুদ্ধ সঙ্গে সঙ্গে কোনও মন্তব্য করলেন না। একটু ভেবে বললেন, "বিচারের পুরো বিবরণ তোমার জানা আছে ?"

"আছে।"

"হত্যাটির কোনও প্রত্যক্ষদর্শী ছিল ?

"না। তবে ওই ছেলেটি ছাড়া আর কেউ ঘটনাস্থলের কাছাকাছি ছিল না। ছেলেটি নিজের মুখে তা স্বীকার করেছে। সাক্ষীরা যখন জয়ানন্দ বণিকের মৃতদেহের কাছে পৌঁছয় রক্তমাখা খঞ্জর তখন ওই ছেলেটির হাতেই ধরা ছিল।"

"এতে কিছু প্রমাণিত হয় না। ছেলেটি হয়তো খঞ্জরটি বাবার বুক থেকে..." অনিরুদ্ধ জোরে জোরে মাথা নাড়ছেন, "না না, এর জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া ধনঞ্জয়ের সমীচীন হয়নি।"

"আমিও তা মানি। কিন্তু..." বল্লালসেন মাথা নত করলেন, "আপনি তো জানেন গুরুদেব, ধনঞ্জয় একটু বেশি কড়া। আপনি সহজে মৃত্যুদণ্ড দিতেনই না, ধনঞ্জয় গত এক বছরে আটজনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। ধনঞ্জয়ের বিচার সম্পর্কে আমার কোনও সংশয় নেই, তবে শাস্তির ক্ষেত্রে তিনি একটু কম কঠোর হলে বোধ হয় ভাল হত।"

"হুম। তুমি ছেলেটিকে বাঁচাতে চাও ?"

"যদি কোনও উপায় থাকে....। ধনঞ্জয়ের আদেশ আমি নাকচ

boiRboi.net

করতেই পারি, কিন্তু সেটা একটা বিশ্রী উদাহরণ হয়ে যাবে। আমার চারজন মহাসামন্ত ধনঞ্জয়কে মহাধর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ধনঞ্জয় যদি মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে পদত্যাগ করেন, তাঁরা হয়তো আহত বোধ করতে পারেন। শিগ্‌গিরই আমি মগধ মিথিলা গৌড় অভিযানে বেরোব, এই সময়ে মহাসামন্তদের আমি বিরূপ করতে চাই না।"

"বুঝলাম। ঘরে তুষের আগুন জ্বললে বাইরে বেরনো কঠিন হয়ে যায়।"

গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন অনিরুদ্ধ। নীরবে কেটে যাচ্ছে সময়। ব্রহ্মপুত্রের স্রোতের কলকল শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। প্রদীপের আলো কমে এসেছে, ঘর জুড়ে আবছায়া।

আলো অন্ধকারে এক সময়ে অনিরুদ্ধর গলা শোনা গেল, "উপায় একটা হলেও হতে পারে।"

"কী উপায়?" বল্লালসেন নড়ে বসলেন।

"কোথায় যেন পড়েছিলাম মৃত্যুযোগ্য অপরাধ করলে দোষীদের না মেরে ফেলে কী যেন একটা করা হয়।....নাঃ, মনে পড়ছে না। স্মৃতি আজকাল আমার সঙ্গে বড় বিশ্বাসঘাতকতা করছে। তোমার যদি আপত্তি না থাকে, আমি একটু জীমূতবাহনকে ডাকব?"

"ও কী করবে? ও কি আপনার থেকে বেশি জানে?"

"জীমূতকে তুমি হেলাফেলা কোরো না বল্লাল। স্মৃতি ন্যায় মীমাংসা ওর কণ্ঠস্থ। শাস্ত্র ঘেঁটে ঘেঁটে আইন বিচার আর শাস্তি নিয়ে ও একটা বই লেখা শুরু করছে।"

"তাই?" বল্লালসেনের এবার সামান্য কৌতূহল হল। বললেন, "ডাকুন তা হলে। কিন্তু এমনভাবে আলোচনা করুন যাতে ওই ছেলেটিকে যে আমি বাঁচাতে চাইছি তা কোনওভাবে

boiRboi.net

প্রকাশ না পায়।"

"বেশ।"

জীমূতবাহন সিঁড়ির নীচেই অপেক্ষা করছিল, অনিরুদ্ধর ডাকে ঘরে এল।

অনিরুদ্ধ বিনা ভনিতায় জিজ্ঞেস করলেন, "জীমূতবাহন, তুমি কি বলতে পারো মৃত্যুদণ্ড পাওয়া অপরাধীর শাস্তি নাকচ না করে কীভাবে তাকে বাঁচিয়ে রাখা যায়? কোন এক শাস্ত্রে এর উল্লেখ আছে না?

জীমূতবাহন ঝটিতি উত্তর দিল, "শাস্ত্রে নেই, একটি বৌদ্ধ পুঁথিতে আছে।"

"খুলে বলো।"

"শৈশবে আমি এরকম একটা জনশ্রুতি শুনেছিলাম। এবার তক্ষশিলা মহাবিহারে পড়াশুনো করতে গিয়ে একটি বৌদ্ধ পুঁথি আমার নজরে আসে। পুঁথিখানার নাম নেই, সম্ভবত তিব্বতদেশের কোনও ভিক্ষুর রচনা। তাতে বলা হচ্ছে হিমালয়ের কোনও এক দেশে নাকি মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য অপরাধ করলে দণ্ড ঘোষণা করা হয় বটে, তবে সঙ্গে-সঙ্গে অপরাধীদের তুলে দেওয়া হয় মন্দিরের পুরোহিতদের হাতে। অপরাধীকে মৃত মানুষ ধরে নিয়ে পুরোহিতরা তাকে দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করাতে পারেন। লোকটা মরে গেলেও পুরোহিতদের কোনও দোষ হবে না, কারণ সমাজের চোখে সে তো মরা'ই। বলতে পারেন দেবতার উদ্দেশে বলিপ্রদত্ত হয়ে যায় সে।

"হুঁ, তা হলে আমি ঠিকই জানতাম।" অনিরুদ্ধ ঘাড় নাড়লেন, "ঠিক আছে, তুমি এখন চলে যেতে পারো। কাল আমি তোমার সঙ্গে আলোচনায় বসব।"

জীমূতবাহন অবাক চোখে একবার রাজার দিকে তাকাল,

boiRboi.net

একবার অনিরুদ্ধর দিকে। তারপর দু'জনকেই অভিবাদন করে ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

জীমূতবাহনের পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতেই অনিরুদ্ধ বলে উঠলেন, "শুনলে তো বল্লাল ?"

বল্লালসেন ঘাড় নাড়লেন, "হুঁ। কিন্তু কোথায় কোন অনার্য দেশে কী প্রথা আছে তা কি এই বঙ্গদেশে চলবে ?"

"খুব চলবে। তুমি একটু কৌশল করো। ওই প্রথার হুবহু অনুকরণ না করে নিজের মতো করে ভাবো। ধরো, তুমি এমন একটা প্রথা চালু করলে যাতে সমাজের উপকারও হয়, আবার তোমার উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয়।"

"কীরকম ?"

"নরদত্ত চক্রপাণিদত্তর পরে তো এদেশে আয়ুর্বেদ নিয়ে নতুন গবেষণা আর হচ্ছেই না। শল্যচিকিৎসাও লাটে উঠছে। ধরো, যাদের মৃত্যুদণ্ড হয়েছে বা হবে তাদের যদি তুমি কবিরাজদের হাতে তুলে দাও কবিরাজরা তাদের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে নতুন নতুন ওষুধ বার করতে পারেন। গবেষণার জন্য আস্ত আস্ত মানুষ পেলে কবিরাজদের কত সুবিধে হয় বলো তো! এতে চিকিৎসাশাস্ত্রেরও উন্নতি হবে, তোমার নামও ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে থাকবে। সবাই তোমার জয়গান গাইবে বল্লাল।"

কথাটা ভীষণভাবে মনে ধরল বল্লালসেনের। তবু যেন খুঁতখুঁতুনি যায় না। বললেন, "মৃত্যুদণ্ড একেবারে তুলে দেব ? এ কি একদম বৌদ্ধদের মতো কাজ হবে না ?"

"মোটেই না। মৃত্যুদণ্ড থাকবে। দেশদ্রোহীদের তুমি যেমন শূলে চড়াও, চড়াতে পারো। অক্ষম জরাগ্রস্ত অপরাধীদেরও বৈদ্যদের হাতে তুলে দিয়ে কোনও লাভ নেই, তাদেরও স্বচ্ছন্দে জ্যান্ত পুঁতে ফেলা যায়। শুধু সুস্থ সবল, মানে ওই ছেলেটির

boiRboi.net

boiRboi.net

মতো কোনও অপরাধীদের..."

"আর বলতে হবে না গুরুদেব। বুঝে গেছি।"

বল্লালসেন উজ্জ্বল মুখে উঠে দাঁড়ালেন। জয়ানন্দর ছেলেটিকে কোন্ বৈদ্যের হাতে তুলে দেবেন তাও মাথায় এসে গেছে। রাঢ় দেশের নামী কবিরাজ জীবদত্ত এখন বিক্রমপুরেই আছেন। ত্রিবিক্রম শর্মার বাড়িতে। রাজসভায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন জীবদত্ত, গাছগাছড়া থেকে বিভিন্ন বিষের প্রতিষেধক বার করতে তিনি খুবই আগ্রহী। তবে তার আগে নতুন প্রথাটির কথা তাঁকে ঘোষণা করতে হবে। আজই। এই মুহূর্তে। ধনঞ্জয় কি তড়িঘড়ি এই প্রথা চালু করার গূঢ় রহস্য বুঝে ফেলবেন? রাগ করবেন? মনে হয় না। ধনঞ্জয় শক্ত ধাতের মানুষ বটে, কিন্তু খল নন। রাজার মহৎ কাজে তিনি সহায়ই হবেন।

কুঠা ঝেড়ে ফেলে গুরুপ্রণাম সেরে ত্বরিত পায়ে বাইরে এসেছেন রাজা বল্লালসেন। নীচেই খুঁটিতে বাঁধা প্রিয় ঘোড়া হারীত, খুশি-খুশি মুখে হারীতের পিঠ চাপড়ালেন। তেষট্টি বছর বয়সেও রাজা বল্লালসেন যুবকের মতো তরতাজা। নিয়মিত তলোয়ার খেলেন, মল্লক্রীড়াও করেন, ফলে শরীরের প্রতিটি পেশি তাঁর অত্যন্ত সবল। রেকাবে পা ছুঁইয়ে এক লাফে ঘোড়ায় উঠেছেন তিনি, মুঠোয় লাগাম ধরে দ্রুত ছুটেছেন নগরের দিকে।

প্রাসাদে ফিরে গ্রন্থাগারে গিয়ে বসলেন বল্লালসেন। এ ঘরটি তাঁর বড় প্রিয়। প্রতিদিনই রাতে খাওয়াদাওয়ার পর এ ঘরে কিছুক্ষণ কাটান। পড়াশুনো করার সঙ্গে-সঙ্গে দানসাগর নামে একটি বই লেখাও শুরু করেছেন তিনি।

আজ গ্রন্থাগারে বসেই হাঁক পাড়লেন, "অর্কদাস?"

প্রধান শিরোরক্ষক যথারীতি দরজার পাশেই ছিল। দৌড়ে

এসেছে, "বলুন মহারাজ।"

"ঘোষককে এখনই খবর দাও। আমি এক্ষুনি একটা আইন জারি করব। রাত্রেই ঢেঁড়া পিটিয়ে নগরবাসীদের জানিয়ে দিতে হবে।"

অর্কদাস কখনও কোনও প্রশ্ন করে না। তারও আজ মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেল, "এই রাত্রেই জারি করবেন? এমন কী জরুরি আইন মহারাজ?"

"যথাসময়ে জানতে পারবে। যা বলছি করো।"

নিভৃতে বসে আইনটার বয়ান মুসাবিদা করতে আরম্ভ করলেন বল্লালসেন। কী নাম দেওয়া যায় প্রথাটার? রোমাঞ্চকরভাবে বেঁচে থাকবে বা মরে যাবে ওই সাজা পাওয়া মানুষগুলো, এর একটা সুন্দর গালভরা নাম দিলে কেমন হয়? ঝট করে একটা শব্দ মাথায় এসে গেল। রোমথা। দু-তিনবার শব্দটাকে আওড়ালেন রাজা। রোমথা। রোমথা। বেশ শোনাচ্ছে। হ্যাঁ, 'রোমথা'ই ভাল।

হঠাৎই অন্য একটা চিন্তা রাজার মাথায় ঢুকে পড়ল। লোকগুলো কি কবিরাজের কাছে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় থাকবে? উহুঁ, তা তো সম্ভব নয়। কিন্তু ছাড়া থাকলে যদি পালায়? যদি দূর দেশে গিয়ে নাম পরিচয় ভাঁড়িয়ে নতুন জীবন শুরু করে দেয়? তবে তাকে চেনা যাবে কী করে?

না, আইন আরও বেঁধেছেঁদে করতে হবে। ভুরুর ভাঁজ বেড়ে গেল রাজার। আবার হাঁক পাড়লেন, "অর্কদাস?"

পলকে অর্কদাস হাজির, "খবর পাঠিয়ে দিয়েছি মহারাজ। ঘোষক এসে পড়ল বলে।"

"ঠিক আছে, তারা এসে অপেক্ষা করুক। তুমি আমার সঙ্গে চলো। আমি এক্ষুনি ত্রিবিক্রম শর্মার বাড়ি যাব।"

boiRboi.net

কাল সারারাত নিথর বসে ছিল অরুণাশ্ব। মৃত্যুদণ্ড শোনার পর থেকে তার বুকের ভেতরটা কেমন অসাড় হয়ে গেছে। এমনটাই বুঝি হয়। কোথাও কোনও আশার আলো যখন আর থাকে না, মন থেকে শোক অভিমান হতাশা সবই যেন মুছে যায়। কারুর ওপর আর রাগটাগও নেই অরুণাশ্বর, কোনও আক্রোশও নেই। একটাই আফসোস, মার সঙ্গে আর এ জীবনে দেখা হল না।

আশ্চর্য, মৃত্যু শিয়রে নিয়ে ভোরের মুখে অরুণাশ্বর চোখ জড়িয়ে এল! ছেঁড়া-ছেঁড়া ঘুম, যতসব বিশ্রী-বিশ্রী দুঃস্বপ্ন-মাখা। শেয়ালে তার পা কেটে নিচ্ছে! একপাল শকুনি খুবলে খুবলে নিচ্ছে চোখ কান মুখ। তন্দ্রা ভেঙে যাচ্ছে, আবার নামছে। ঘোর পুরোপুরি কাটল প্রতিহারের ডাকে। ভীষণ চমকে অরুণাশ্ব চোখ খুলল। সময় কি তবে এসে গেল!

প্রতিহার লোহার দরজা খুলছে, "কপাল করে এসেছিলে বটে। যাও, এবারকার মতো বেঁচে গেলে।"

কথাটা অরুণাশ্বর মাথাতেই ঢুকল না।

প্রতিহার গোঁফ মুচড়োল, "হাঁ করে দেখছ কী? তুমি বেঁচে গেছ। তোমাকে এখন রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হবে।"

"কেন?" অরুণাশ্ব ভয়ে ভয়ে তাকাল।

"গেলেই জানতে পারবে।" বলেই হাঁকাহাঁকি করছে, "অ্যাই, গেলে কোথায় তোমরা? চটপট কাজ সারো।"

অরুণাশ্ব এতক্ষণে লক্ষ করল প্রতিহারের পেছনে আরও দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনেরই বেশ সাঙ্ঘাতিক চেহারা। কিছু বোঝার আগেই একজন ভেতরে ঢুকে অরুণাশ্বকে দেওয়ালে ঠেসে ধরল, অন্য জন তীক্ষ্ণ সুচ ফুটিয়ে তার কপালে উল্কি আঁকা শুরু করেছে।

যন্ত্রণায় ছটফট করছে অরুণাশ্ব। প্রাণপণে ছাড়ানোর চেষ্টা

boiRboi.net

করছে নিজেকে। কিন্তু তার শরীরে আর তেমন বল কোথায় এঁটে ওঠার ? ক্রমে নিস্তেজ হয়ে এল।

দেখতে দেখতে অরুণাশ্বর কপালে একটা শব্দ ফুটে উঠল। রোমথা।

ইছামতীর তীরে সার সার নৌকো বাঁধা। বেশিরভাগই ডিঙি কিংবা ছিপ, কিছু খেয়াতরীও আছে। ওপারে ছোট-বড় গ্রাম, সেখান থেকে দিনভর লোকজন আসে বিক্রমপুর নগরে। এই ঘাট দিয়েই। বাণিজ্যের নৌকো এখান থেকে বড় একটা ছাড়ে না, তার জন্য ব্রহ্মপুত্রে আলাদা ঘাট আছে।

আজ ছোট নৌকোর মাঝে একটি বড় নৌকোও শোভা পাচ্ছে। চওড়া পাটাতনে তার ঘোরাফেরা করছে জনাচারেক সাধারণ সৈনিক, তাদের চামড়ার জুতোর চাপে নৌকোটি কেঁপে কেঁপে উঠছে। আশপাশের নৌকোগুলোয় তেমন চাঞ্চল্য নেই, মাঝিমাল্লারা আপন আপন কাজে ব্যস্ত। কেউ রান্নায়, কেউ কেউ অলস গল্পে, কেউ-বা শুধুই উদাসীন।

বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হল। সূর্য খাড়া মাথার ওপর। চড়া রোদ মাথায় নিয়ে বড় নৌকোর ছাদে দাঁড়িয়ে আছেন দু'জন মানুষ। একজন মাঝবয়সী, পরনে তাঁর যোদ্ধার পোশাক। নাম বিরোচন। তিনি রাজা বল্লালসেনের এক গণস্থ। অর্থাৎ কিনা সাতাশটা রথ, সাতাশ হাতি, একাশিটি ঘোড়া আর একশো পঁয়ত্রিশজন পদাতিক সৈন্যের তিনি সর্বময় কর্তা। বিরোচন খুব

boiRboi.net

মেজাজি মানুষ। অহঙ্কারীও। নৌকোয় উঠেই তিনি মাঝিমাল্লাদের বকাবকি শুরু করেছেন, তাঁর ভয়ে সকলেই বেশ তটস্থ। অন্য মানুষটির বয়স প্রায় বছর ষাটেক। কাঁকলাসের মতো অতি শীর্ণ চেহারা। পরে আছেন খাটো ধুতি, খালি গায়ে পাতলা উত্তরীয়। ইনিই কবিরাজ জীবদত্ত। ইনিও যথেষ্ট মেজাজী, তবে তেমন হাঁকডাক নেই। খিটখিটে স্বভাবের মানুষটি বিরোচনের দাপাদাপিতে খুবই বিরক্ত হয়ে রয়েছেন।

বিরোচনও বুঝি তা টের পাচ্ছেন। কারণে অকারণে খোঁচাচ্ছেন মানুষটিকে, "আর কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে বলুন তো বৈদ্যমশাই ? বেলা যে গড়িয়ে যায়।"

জীবদত্ত মুখ ঘুরিয়ে পাড়ের দিকে তাকালেন। দূরে রাজপ্রাসাদের সোনালি চূড়া দেখা যায়, সেদিকে চোখ ফেলে উদাস ভাবে বললেন, "আসবে। এসে যাবে।"

"উহু, আমার মনে হয় নতুন কোনও গণ্ডগোল বেধেছে। বন্দিকে বার করবে, ঘাড় ধরে এনে সোজা নৌকোয় তুলে দেবে, এর মধ্যে এত দেরিটা কীসের ? আপনার বন্দি টেঁসেফেঁসে গেল না তো ?"

জীবদত্ত তেরচা চোখে তাকালেন, "আমার বন্দি নয়। মহারাজ বল্লালসেনের বন্দি।"

"ওই হল। বন্দি না বলে আপনার দাস বলতে পারেন। বিনি মাইনের কাজের লোক।"

জীবদত্ত খিঁচিয়ে উঠতে গিয়েও সামলে নিলেন। তিনি হলেন গিয়ে ভুবনবিখ্যাত কবিরাজ চক্রপাণিদত্তের বংশধর। এই অর্ধশিক্ষিত যুদ্ধবাজটির সঙ্গে তাঁর তর্ক করা সাজে না। ত্রিবিক্রম শর্মার কথায় নেচে আজই সাততাড়াতাড়ি ছেলেটাকে নিয়ে পাড়ি না দিলেই হত। অন্তত এই বিরোচনের সঙ্গী হতে হত না।

boiRboi.net

প্রায়ই তো কোনও-না-কোনও রাজকর্মচারী যাচ্ছেন রাঢ়ের পথে, বিক্রমপুরে আর ক'টা দিন বিশ্রাম নিয়ে তাঁদেরই কারুর নৌকোয় যাওয়া উচিত ছিল।

বন্দির প্রসঙ্গ এড়িয়ে পালটা প্রশ্ন জুড়লেন জীবদত্ত, "আপনার গন্তব্য যেন কদ্দূর ?"

"আপাতত কর্ণসুবর্ণ। ওখানে মহাসামন্ত দেবকীর্তির কাছে থাকব ক'দিন। তারপর লোকলস্কর নিয়ে কজঙ্গলের দিকে রওনা দিতে হবে।"

"কজঙ্গলের কোথায় ?" জীবদত্ত ব্যঙ্গ ছুড়লেন, "বনে বাদাড়ে জীবজন্তুদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন নাকি ?"

"প্রায় তাই। মহারাজ আমাকে হাতি সংগ্রহ করতে বলেছেন।"

বিরোচনের পাহাড়ের মতো শরীরটাকে আরেকবার বাঁকা চোখে দেখলেন জীবদত্ত। বিদ্রূপের হাসি হেসে বললেন, "কেন, মহারাজের হস্তিবল কিছু তো কম নেই !"

বিরোচন শ্লেষটা ধরতেই পারলেন না। কোষ থেকে ঝটাং তলোয়ার বার করেছেন। নিজের মনে ঘোরাচ্ছেন শূন্যে। হঠাৎ কী ভেবে বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, "চাঁদ ? অ্যাই চাঁদ ?"

চাঁদ এই নৌকোর দিশারু। মাঝিমাল্লাদের প্রধান। তাগড়াই দেহ, কুচকুচে কালো রং। সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে উঠে এল সে, "আজ্ঞে আমায় ডাকছেন ?"

"জোয়ারের আর কত দেরি ?"

"এই এসে গেল বলে।"

"আজ কত দূর যেতে পারবে মনে হয় ?"

"আজ্ঞে, পদ্মাবতীর খালে সন্ধে সন্ধে পৌঁছে যাব। রাত্তিরে আজ যাত্রাপুরেই থাকা কিনা।"

boiRboi.net

"যাত্রাপুরে কেন ?"

"ওখানে কিছু কেনাকাটি আছে। তার পরে তো আর তেমন কোনও বড় লোকালয় পড়বে না। .....তা ছাড়া আজ্ঞে এ সময়ে বাতাস বড় এলোমেলো, রাতের বেলা নৌকো না বাওয়াই ভাল।"

"যত সব ফাঁকিবাজি কথাবার্তা।" বিরোচন গর্জে উঠলেন, "কোনও চালাকি চলবে না। এক ঘণ্টায় যা কেনার কিনে রওনা হবে। কর্ণসুবর্ণ পৌঁছতে যেন পাঁচদিনের বেশি না লাগে।"

"আজ্ঞে, রাতে নৌকো চালানোর আরও বিপদ আছে। কোথায় কখন জলদস্যুরা হানা দেয়...."

"আমার নৌকোয় জলদস্যু হানা দেবে, এতদূর স্পর্ধা! জানো, স্বয়ং মহারাজ আমাকে তলোয়ার খেলায় ডাকেন! আমি একাই একশোটা জলদস্যুর মুণ্ডু নামিয়ে দিতে পারি।"

বিরোচনের কথা শেষ হতে-না-হতেই নদীর পাড়ে শোরগোল। দুই প্রতিহার অরুণাশ্বকে নিয়ে আসছে। সঙ্গে-সঙ্গে ঘাটে অপেক্ষমাণ মানুষজন হুড়মুড়িয়ে ছুটেছে সেদিকে। লোকমুখে এই অভিনব বন্দির কথা চাউর হয়ে গেছে, সকলেই একবার তাকে কাছ থেকে দেখতে চায়। কিছু অতি উৎসাহী হুমড়ি খেয়ে পড়ল আগুয়ান অরুণাশ্বর গায়ে। প্রতিহারেরা বল্লম উঁচিয়েও তাদের সরাতে পারছে না।

অরুণাশ্বর মুখ আজ আশ্চর্যরকমের ভাবলেশহীন। তার পায়ে বেড়ি, হাতে শিকল। লোহার বেড়ি পরা পা দুটো টেনে সে টলে টলে হাঁটছে। হাঁটার ভঙ্গি দেখে মনে হয় সে বুঝি কালা, বোবা, অন্ধ। চারপাশের কিছুই যেন সে টের পাচ্ছে না। কিন্তু তা নয়। ভাল করে লক্ষ করলে বোঝা যায় তার কালিমাখা চোখের কোলে কান্না জমাট বেঁধে আছে।

অর্কপ্রভ দত্তগুপ্ত
বই নং 732
তারিখ
ফোন
অরুনেন্দু ভবন, শিলিগুড়ি
7 MAY 2009

অরুণাশ্বকে নৌকোয় তোলা হতেই ব্যস্তসমস্ত পায়ে পাটাতনে নেমে এলেন জীবদত্ত। পেছন পেছন বিরোচনও, হাতে তাঁর খোলা তলোয়ার।

প্রতিহার জীবদত্তর হাতে শিকল বেড়ির চাবি তুলে দিল। অভিবাদন জানিয়ে বলল, "আমাদের কাজ শেষ বৈদ্যমশাই। এবার কিন্তু সব দায়িত্ব আপনার। আর হ্যাঁ, মহাধর্মাধ্যক্ষ ধনঞ্জয় আপনার জন্য একটি বিশেষ নির্দেশ পাঠিয়েছেন।"

জীবদত্ত চোখ ঘোরালেন, "কী নির্দেশ ?"

"প্রতি মাসে একবার করে মণ্ডলাধিপতির কাছে যেতে হবে আপনাকে।"

মণ্ডলাধিপতি থাকেন সেই কঙ্কগ্রামে। আশপাশের বেশ কিছু গ্রাম বা বীথি নিয়ে গঠিত মণ্ডলের তিনি প্রশাসক।

জীবদত্ত অসন্তুষ্ট স্বরে প্রশ্ন করলেন, "কেন ? সেখানে যেতে হবে কেন ?"

"ছেলেটা আপনার কাছে আছে, না পালিয়ে গেল সেটা আপনাকে জানিয়ে আসতে হবে। যদি পালায় তবে কীভাবে পালাল, তাকে ধরার জন্য আপনি কী ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, তাও। .....মরে যদি যায় সে সংবাদটিও জানাবেন।"

দুই প্রতিহার নৌকো থেকে নেমে গেল।

জীবদত্ত গজগজ শুরু করেছেন, "এ তো মহা ঝঞ্ঝাট হল। মহারাজ তো আমায় সভায় ডেকে এসব শর্তের কথা কিছু বলেননি !"

বিরোচন কাজে নেমে পড়েছেন। তলোয়ারের ডগা দিয়ে আলগা খোঁচা দিলেন অরুণাশ্বর পেটে, "কী হে ছোঁড়া, পালানোর ইচ্ছে আছে নাকি ? নৌকো থেকে লম্ফ দেওয়ার চেষ্টা করলে কিন্তু মুণ্ডু নামিয়ে দেব।"

pathboi.net

পলকের জন্য তীব্র চোখে বিরোচনের দিকে তাকাল অরুণাশ্ব। পরক্ষণে মাথা নামিয়ে নিল।

জীবদত্তও রাগ-রাগ মুখে একঝলক দেখলেন বিরোচনকে। লোকটা কি মুণ্ডু নামানো ছাড়া আর কিছু জানে না! বেশি তর্জন-গর্জন যারা করে তারা অবশ্য দরকারের সময়ে কাজের কাজটি করতে পারে না।

বিরোচনকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে অরুণাশ্বর হাতের শিকল খুলে দিলেন জীবদত্ত। গলাখাঁকারি দিয়ে ডাকলেন, "চাঁদ? এদিকে শোনো।"

নৌকো ছাড়ার তোড়জোড় চলছে, চাঁদ উঠে পড়েছে গুণবৃক্ষের মাথায়। জীবদত্তর ডাক শুনে পাল খাটানোর উঁচু দণ্ডটার টঙ থেকে তরতর নেমে এল। ঘাড় ঝুঁকিয়ে বলল, "আজ্ঞা করুন বৈদ্যমশাই।"

"এই ছেলেটাকে নিয়ে গিয়ে দাঁড়ে বসিয়ে দাও। শুধু-শুধু ক'টা দিন অন্ন ধ্বংস করবে কেন, খাটুক।"

চাঁদ অরুণাশ্বকে সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

কুলকুল শব্দ বাজছে ইছামতীর জলে, টিপ টিপ দুলছে নৌকো। জোয়ার এসে গেল।

হঠাৎ নৌকো ছাড়ার মুখে মুখে এক মূর্তিমান বাধা এসে উপস্থিত। একটা নাদুসনুদুস লোক হাঁপাতে-হাঁপাতে দৌড়ে আসছে ঘাটের দিকে। ন্যাড়া মাথায় মোটা টিকি, খালি গা, থলথল করছে ভুঁড়ি, বগলে ইয়া এক পুঁটলি। ছুটতে-ছুটতে চেঁচাচ্ছে লোকটা, "ও সেনাপতিমশাই, নৌকো থামান, নৌকো থামান। আমি যাব।"

বিরোচন ছাদে ফিরে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে হুঙ্কার ছাড়লেন, "এ নৌকো সাধারণের জন্য নয়।"

pathagar.net

"গরিব বামুনকে একটু ঠাঁই দিন সেনাপতিমশাই। সদাশিব আপনার মঙ্গল করবেন।"

"না, নাহ। এখানে জায়গা হবে না।"

লোকটা হাউমাউ চিৎকার জুড়ে দিল, "কাজটা কিন্তু ভাল হচ্ছে না সেনাপতিমশাই। মহারাজ যদি জানতে পারেন আপনি বিপন্ন বামুনকে তাড়িয়ে দিয়েছেন...."

বিরোচন একটু থমকে গেলেন। তিনি জানেন ব্রাহ্মণদের ওপর রাজা বল্লালসেনের অগাধ ভক্তি। বেজার মুখে বললেন, "কোথায় যাওয়া হবে শুনি?"

"ঠিক নেই। ভাগ্য অন্বেষণে বেরিয়েছি। জায়গা বুঝে কোথাও একটা নেমে যাবখ'ন।"

"তা হলে আর কী, আসুন।"

মাঝি আবার কাঠের তক্তা পেতে দিল। বগলের পোঁটলা সামলাতে সামলাতে গুট গুট উঠে এল লোকটা। ধপ করে পাটাতনে বসে পড়ে বলল, "বাপ রে, রোদের কী তেজ। একেবারে খামচে দিচ্ছে!"

সৈনিক চারজন গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছে লোকটাকে। এক সৈনিক বলল, "তা বাপু, এই ভরদুপুরে তোমার বেরনোরই বা কী দরকার ছিল?"

"ওমা, বেরোব না! কী বলে গো!" লোকটা হাতের পিঠে মুখের ঘাম মুছছে, "ভোররাতে আমার স্বপ্ন যে স্বপ্ন দেখল গো। আজ দুপুরে পশ্চিম দেশে রওনা দিলে আমার নাকি ভাগ্য খুলে যাবে।"

"বটে, বটে? তা এ দেশে অসুবিধে কী হল? মহারাজ তো এখানে ব্রাহ্মণদের কোনও অভাব রাখেননি!"

"সবার কপাল কি সমান বাবা? টোল খুললাম, ছাত্র আসে

boiRboi.net

না। কোচ্‌কি দুয়ারের মুখে যে শিবমন্দিরটা আছে, সেখানে ঘণ্টা নাড়তে বসলাম, কেউ তেমন প্রণামী দেয় না। কত আর গিন্নির মুখঝামটা সহ্য করা যায়!"

"তা শিবরাত্রির দিন রানিমা তো ব্রাহ্মণদের ভূমি দান করলেন, তুমি কি দু-চার পাটকও জোটাতে পারোনি?"

"যেতে পারলে তো পেতাম। যাওয়া হল কই! সেদিনই এমন উদরপীড়া হল।" লোকটা গাল ছড়িয়ে হাসল, "আমি একটু বেশি বেশি খেয়ে ফেলি কিনা, হঠাৎ হঠাৎ হজমের গণ্ডগোল হয়ে যায়।"

চার সৈনিক অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

নৌকো যাত্রা শুরু করেছে। পাল খাটিয়ে দিয়েছে চাঁদ, গেরুয়া জল কেটে ছপ ছপ এগোচ্ছে তরী। দেখতে দেখতে মাঝনদীতে চলে এল, পাড় সরে গেছে দূরে। দেখতে দেখতে নগরীর প্রাচীর, অট্টালিকা, রাজবাড়ির চূড়া দিগন্তে মিলিয়ে গেল। এখন দু'পাশে ছবির মতো গ্রাম। ইছামতী তেমন একটা চওড়া নদী নয়, মাঝনদী থেকে গ্রামের কচি ছাগলছানাগুলোকেও দিব্যি দেখা যায়। ছোট ছোট ঘাটে বউ-ঝিরা জল নিতে এসেছে, ছেলেমেয়ের দল সাঁতারে নেমেছে, জেলেনৌকো ঘুরছে ইতস্তত, নিদারুণ তাপেও পৃথিবী এখন ভারী মায়াময়।

দুপুরের রান্না আগেই সেরে রেখেছিল নৌকোর পাচক। ভাত, মাছের ঝোল আর লাউয়ের তরকারি। খেয়েদেয়ে নিজের ঘরটিতে একটু শুতে এলেন জীবদত্ত। সুন্দর সাজানোগোছানো বিছানা, জানলা দিয়ে ফুরফুর হাওয়া আসছে, তন্দ্রায় জীবদত্তর চোখ জড়িয়ে এল।

তা ঘুমোনোর কী উপায় আছে। পাশের ঘরটিতে গাঁক গাঁক নাক ডাকাচ্ছেন বিরোচন। তাঁর নাসিকাগর্জন তাঁর হাঁকডাকের

থেকেও বিদ্‌ঘুটে। কখনও মনে হয় একপাল লোক একসঙ্গে বেসুরে বাঁশি বাজাচ্ছে, কখনও মনে হয় বাঘ ডাকছে, কখনও মনে হয় ফেউ। নীচে সৈনিকরাও কম হল্লা জোড়েনি। বামুনটাকে নিয়ে জোর রঙ্গরসিকতায় মেতেছে সকলে।

দাঁত কিড়মিড় করতে করতে জীবদত্ত উঠে বসলেন। তখনই অরুণাশ্বর কথা মনে পড়ে গেল। কেমন অদ্ভুত ভাবে গবেষণার উপকরণটা জুটে গেল, এখনও যেন বিশ্বাস হয় না! মহারাজেরই বা বৈদ্যদের সুবিধে দেওয়ার জন্য এমন প্রথার কথা মাথায় এল কেন? কে জানে, রাজরাজড়াদের কখন কী উদ্ভট খেয়াল হয়! এমন একটা পড়ে পাওয়া সুযোগ হাতে যখন এসে গেছে, এবার সেটাকে মোক্ষম ভাবে কাজে লাগাতে হবে। জ্যান্ত মানুষ যখন জুটেই গেল, সাপের বিষের অব্যর্থ প্রতিষেধক তিনি বার করবেনই। এমন প্রতিষেধক যা সব সাপের বিষকে রুখে দিতে পারে। আচ্ছা, বিষ শরীরে নিয়ে ছেলেটা কতদিন যুঝতে পারবে? কাল যখন মহারাজ সভায় ডেকে ছেলেটাকে তাঁর হাতে তুলে দিলেন, ছেলেটা কাঁপছিল খুব। কেন কাঁপছিল? ভয়ে? প্রাণে বেঁচে যাওয়ার আনন্দে? না কি দেহে কোনও ব্যাধি আছে? উহু, আজ তো দেখে মনে হল ছেলেটা সুস্থই। সম্পূর্ণ নীরোগ। যেভাবে বিরোচনের দিকে কটমট তাকাল, মনে হয় ছেলেটার তেজও আছে যথেষ্ট। বেশি তেজ থাকা অবশ্য ভাল নয়, কড়া শাসনে রাখতে হবে। নাঃ, পালাতে ও পারবে না। কপালে রোমথা লেখা আছে, যেখানেই যাক ধরা পড়বেই।

ভাবতে-ভাবতে বিছানা থেকে নামলেন জীবদত্ত। ঘুম যখন হলই না, নীচে যাওয়া যাক। ছেলেটার হাবভাব এখনই একটু বুঝে নেওয়া দরকার।

নৌকোর খোলে বসে দাঁড় টানছে ছয় দাঁড়ি। তাদের সঙ্গে

boiRboi.net

অরুণাশ্বর হাতও চলছে অবিরাম। গলগল ঘামছে ছেলেটা, শ্বাস ফেলছে জোর জোর।

জীবদত্ত সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, "শোনো।"

হঠাৎই খুব অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল অরুণাশ্ব। মাঝনদী বেয়ে পালতোলা নৌকো তরতর এগিয়ে চলেছে, দাঁড় বাইতে-বাইতে কখন যেন স্রোতের সঙ্গে দূরে চলে গেছে মন। অনেক দূরে। এ-নদী থেকে বাঁক নিয়ে আর-এক নদী, তার পাড়ে সুবর্ণগ্রাম, সেইখানে। দিব্যচক্ষে অরুণাশ্ব দেখতে পাচ্ছে নিজেদের বাড়িটাকে। দোতলা দালানকোঠার আঙিনায় একা-একা দাঁড়িয়ে আছেন তার অভাগিনী মা। খোলা চুল ছড়িয়ে পড়েছে পিঠের ওপর, দুপুরের দমকা বাতাসে এলোমেলো উড়ছে। কাঁদছেন কি মা? দু' চোখে জল টলটল করছে কেন? একবার কি অরুণ বলে ডেকে উঠলেন? ফুঁপিয়ে উঠলেন একটু?

জীবদত্তর ডাক শুনে ঘোর ছিঁড়ে গেল। চমকে তাকিয়েছে অরুণাশ্ব। মুহূর্তের জন্য ঠিক চিনে উঠতে পারল না মানুষটাকে, পরক্ষণে শশব্যস্ত, "আজ্ঞে, আমায় ডাকছেন?"

"তোমাকে না তো কী, হাওয়াকে?"

খিঁচনো কণ্ঠস্বর। অরুণাশ্ব মাথা নামিয়ে নিল। এই জীবদত্ত এখন তার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, এঁর সামনে চোখ তুলে কথা বলাও বোধ হয় স্পর্ধা দেখানো হয়। দাঁড় টানা থামাবে কি? কাজে অবহেলা দেখলে যদি ইনি আবার অসন্তুষ্ট হন? মাথা ঝুঁকিয়ে

boiRboi.net

প্রণাম করবে একটা ? যদি অতি ভক্তি ভেবে বিরক্ত হন ?

অরুণাশ্বর ভাবনার মাঝেই দু-এক পা কাছে এগিয়েছেন জীবদত্ত। চোখ কুঁচকে ব্যঙ্গের সুরে বলে উঠলেন, "দাঁড়ে বসার ভালই অভ্যেস আছে দেখছি !"

দাঁড়িরা গল্পগুজব থামিয়ে নীরব হয়ে গেছে। একবার চোখ তুলে তাদের দেখেই মাথা নোওয়ালো অরুণাশ্ব। বিনয়ী স্বরে বলল, "আজ্ঞে, নাও বাইতে আমি ভালবাসি।"

"ভালবাসো ! তুমি না বণিকের ছেলে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"বুঝেছি। এসব বখামি করেই দিন কাটত।"

অরুণাশ্ব সাহস করে প্রতিবাদ করতে পারল না। তাদের সুবর্ণগ্রামের একদিক ছুঁয়ে বয়ে গেছে ব্রহ্মপুত্র, মেঘনাও তাদের বাড়ি থেকে বেশি দূর নয়। সেই কোন ছোট্টবেলা থেকে সে জলের পোকা। নদীর কোলে দাপাদাপি করেই সে বড় হয়েছে। কখনও সাঁতার কাটা, কখনও ডিঙি বাওয়া, কখনও মাছ ধরার নৌকো চড়ে চলে যাওয়া অথই জলে। নৌকো বাওয়া যে কীভাবে তার রক্তে মিশে গেছে এ-কথা জীবদত্ত কী করে বুঝবেন ?

জীবদত্ত ঝুঁকে পড়ে অরুণাশ্বর হাতের পেশি টিপে টিপে দেখলেন, "হুম। এই করে করে দিব্যি গুলি বানিয়েছ, অ্যাঁ ? ভাল ভাল। গায়ে শক্তিঅলা লোকই আমার দরকার।"

অরুণাশ্ব ভয়ে ভয়ে হাসল।

"হাসছ যে বড় ?" আবার জীবদত্তের ধমক, "বলি পেশিচর্চা ছাড়া আর কিছু করেছ টরেছ ? পড়াশুনো ?"

অরুণাশ্ব ঢোক গিলল, "অল্পস্বল্প।"

"কী কী শাস্ত্র পড়েছ ?"

boiRboi.net

জীবদত্ত কি জানেন না বণিকের ছেলের শাস্ত্র পাঠে অধিকার নেই ? নিচু গলায় বলল, "আজ্ঞে, অক্ষরজ্ঞান হয়েছে। অঙ্কও শিখেছি কিছু। যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ, শুভঙ্করী, লাভক্ষতির হিসেব..."

"থাক, থাক। গুণের গুণনিধি !" জীবদত্ত দু' হাত পেছনে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, "তা বাছা, হঠাৎ এমন দুর্মতিটা হল কেন ?"

"আজ্ঞে ?"

"বোকা সেজো না। যা জিজ্ঞেস করছি তার জবাব দাও। বাপটাকে মারতে গেলে কেন ?"

দপ করে দু' চোখ জ্বলে উঠল অরুণাশ্বর, নিভেও গেল। ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, "বাবাকে আমি মারিনি। মিথ্যে অভিযোগে আমার শাস্তি হয়েছে।"

"অ্যাঁঅ্যাঁহ, মিথ্যে অভিযোগ ! কে তোমার এমন উপকারটা করল শুনি ?"

"জানি না। তবে আমি বাবাকে মারিনি।"

"এতজন এসে আচার্য ধনঞ্জয়ের সামনে তোমার নামে মিথ্যে বলে গেল ? এমনি এমনি ?"

দাঁড় টানা থামিয়ে অরুণাশ্ব এবার সোজাসুজি জীবদত্তর চোখে চোখ রাখল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, ওরা সবাই মিথ্যেবাদী। আমি বাবাকে মারিনি।"

এতক্ষণে জীবদত্ত যেন একটু থমকেছেন। বোধ হয় পায়ে বেড়ি, কপালে বড় বড় করে রোমথা দেগে দেওয়া ছেলেটার আকস্মিক তেজ দেখেই। সামান্য গলা নামিয়ে বললেন, "তুমি বলতে চাও তুমিই একমাত্র সত্যবাদী যুধিষ্ঠির ? তা কোন দত্যি-দানো তোমার বাপকে মেরে গেল শুনি ?"

boiRboi.net

"সে আমি বলতে পারব না।"

"তবে অন্যদের দুষছ যে বড় ? শাস্তি পেয়েও তোমার বুঝি লজ্জা হয়নি ?"

কথাটায় উলটো কাজ হল। আচমকা কেমন জেদ চেপে গেল অরুণাশ্বরের। লজ্জা শাস্তি অপমান সবই তো পাওয়া হয়ে গেছে। আর কীসের ভয় ? মরিয়া হয়ে বলে উঠল, "জানি, সত্যি কথা বললে এখন শুধু আমায় উপহাসই শুনতে হবে। কিন্তু আপনি তো জ্ঞানী মানুষ, আপনি বলুন তো কেন আমি আমার বাবাকে মেরে ফেলব ? আমার বাবা সুবর্ণগ্রামের সবচেয়ে ধনী ব্যবসায়ী, তাঁর পাঠানো পান-সুপারি নারকেল মগধ মিথিলা কাশী কোথায় না যায় ! আমিই তাঁর একমাত্র ছেলে, তাঁর অবর্তমানে ব্যবসা ধনসম্পত্তি সবই তো আমার। এমন একটা মূর্খের মতো কাজ করে কেন আমি সর্বস্ব হারাতে যাব ?"

"লোভে পড়ে মানুষ কী না করে!" জীবদত্ত ঠোঁট ওলটালেন।

"কীসের লোভ ? বাবা তো আমার কোনও কিছুর অভাব রাখেননি !"

"হতে পারে বাবার সঙ্গে তোমার ঝগড়াঝাটি হয়েছিল। হয়তো রাগের মাথায়..."

"আমার বাবা ঝগড়াঝাটি করার মানুষই নন। তিনি কাউকে কখনও কটু কথা বলতেন না। আমাকে তো নয়ই। আমি তাঁর প্রাণের অধিক ছিলাম। তিনি আমায় হাতে ধরে ব্যবসার কাজ শেখাচ্ছিলেন।"

"তবে কুসংসর্গে পড়ে করেছ। কোনও বন্ধুবান্ধব নিশ্চয়ই উসকেছে।"

"আমার সেরকম কোনও বন্ধুবান্ধব নেই। বাবা মার সঙ্গই

boiRboi.net

আমার সব থেকে বেশি প্রিয় ছিল।"

"তা হলে রক্তমাখা খঞ্জর তোমার হাতেই পাওয়া গেল কেন?"

অরুণাশ্ব একটুক্ষণ চুপ করে রইল। এই একটা প্রশ্নের উত্তর যে কতবার কত জায়গায় দিতে হল!

"কী হল, বলো? খঞ্জরখানা তো তোমার, নয় কি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। দুর্ভাগ্যবশত খঞ্জরটি আমারই। বাবাই আমাকে উপহার দিয়েছিলেন।"

"চমৎকার। বাবার দেওয়া ছুরি বাবারই বুকে..."

"নাআ।" অরুণাশ্ব প্রায় ডুকরে উঠল, "বিশ্বাস করুন, বাবার মৃত্যুর সময়ে খঞ্জরখানা আমার কাছে ছিল না। খঞ্জরের খাপটি খুব মূল্যবান। অনেক মণিমুক্তো বসানো। পাটলিপুত্রের এক হূন সৈনিকের কাছ থেকে কিনে এনেছিলেন বাবা। আমার কাকার ছেলে ক'দিন আগে ওটার জন্য খুব বায়না ধরে, ছোট ভাইকে আমি ওটা দিয়ে দিয়েছিলাম... আশ্চর্য, কাকা বললেন সে নাকি ওটা হারিয়ে ফেলেছিল!"

"তোমার কাকা?" জীবদত্তর চোখ ছোট হল, "তিনিও কি তোমাদের সঙ্গেই থাকেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তিনিও ব্যবসায়ী?"

"না, বাবার ব্যবসাই দেখেন মাঝে মাঝে। তবে তিনি একটু আমোদপ্রমোদ নিয়ে থাকতেই বেশি ভালবাসেন। বিক্রমপুরেও তাঁর যাতায়াত আছে। এখানেও অনেকে তাঁকে চেনেন।"

"তিনি তোমার বিচারের সময় এসেছিলেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনিও আমায় খুব ভালবাসেন। আমাকে বাঁচানোর প্রাণপণ চেষ্টাও করেছিলেন। আমার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ শুনে কাঁদতে কাঁদতে বিচারকক্ষে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন

BoiRboi.net

তিনি। ... কী করবেন ? সব সাক্ষী যখন আমার বিপক্ষে..."

"কারা সাক্ষী ছিল ?"

"আজ্ঞে, আমাদেরই বাড়ির কর্মচারীরা। ... কাকা তো বাবার মৃত্যুর দিন সুবর্ণগ্রামে ছিলেন না, তাই তিনি আমার হয়ে কিছুই বলতে পারলেন না।"

"কোথায় গিয়েছিলেন তিনি ?"

"শুনেছি বিক্রমপুরেই এসেছিলেন। দু'দিন পরে ফেরেন।"

"অ।" আপন মনে মাথা নাড়ছেন জীবদত্ত। কেমন অদ্ভুত ভাবে। একবার নদীর দিকে তাকালেন, একবার দাঁড়িদের দিকে। হলদেটে চোখের বিচলিত দৃষ্টি আবার ফিরল অরুণাশ্বর ওপর, "সেদিন ঠিক কী ঘটেছিল খুলে বলো তো।"

সংক্ষেপেই সব বলল অরুণাশ্ব। মোটামুটি গুছিয়ে। প্রতিদিন ভোরে হাঁটতে হাঁটতে ব্রহ্মপুত্রের ধারে চলে যেত সে। নির্জন ঘাটে একা একা বসে বাঁশি বাজাত। তারপর সূর্য কমলা থেকে

হলুদবরন হলে ঘরে ফিরত। সেদিনও ফিরছিল। বাড়ির কাছাকাছি এসে হঠাৎই একটা গোঙানির শব্দ শুনতে পেল। এদিক-ওদিক খুঁজতেই দ্যাখে দিঘির পাশে, বুনো ঝোপমতন জায়গাটাতে, কে যেন পড়ে আছে। ছুটে গিয়ে দেখে, বাবা!

তখনও প্রাণ রয়েছে বাবার, যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। অরুণাশ্ব তাড়াতাড়ি বাবার বুক থেকে যেই না ছুরিটা টেনে বার করল, অমনি তিনি নিথর। সঙ্গে-সঙ্গে কোত্থেকে যেন উদয় হল গোষ্ঠক, তাদের বাড়িরই এক কর্মচারী। সে এসেই চিৎকার জুড়ে দিল, 'তুমি তোমার বাবাকে মেরে ফেললে, তুমি তোমার বাবাকে মেরে ফেললে!' তার হাঁকডাকে প্রতিবেশীরা দৌড়ে এল, বাড়ির লোকজনও পৌঁছে গেল। অরুণাশ্বকে হতভম্ব করে দিয়ে গোষ্ঠক তখনও চেঁচাচ্ছে, 'আমি নিজের চোখে প্রভুর বুকে অরুণাশ্বকে ছুরি বসাতে দেখেছি!' অরুণাশ্ব সব বুঝিয়ে বলতে গেল, কেউ তার কথা শুনলই না, টানতে-টানতে নিয়ে এল বাড়িতে। তারপর বাবার দাহকার্য শেষ হয়ে যেতে সকলে মিলে তাকে তুলে দিল দণ্ডপাশিকের হাতে। সেখান থেকে সোজা বিক্রমপুরের কারাগারে নিয়ে আসা হল তাকে। তারপর বিচার... সাজা...

জীবদত্ত মন দিয়ে শুনলেন। তোবড়ানো গালে বিচিত্র হাসি ফুটল, "তোমার কথা আমি বিশ্বাসও করছি না, অবিশ্বাসও করছি না। তুমি দোষী না নির্দোষ সে বিচার ঈশ্বর করবেন। আমি শুধু আশা করব তুমি আমাকে কোনও ঝঞ্ঝাটে ফেলবে না।"

অরুণাশ্ব ফ্যালফ্যাল চোখে তাকাল।

"তোমার শরীরস্বাস্থ্য খুব মজবুত, তায় আবার বয়স কম। চব্বিশ ঘণ্টা তোমাকে পাহারা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ঝোঁকের মাথায় পালানোর চেষ্টা কোরো না। তোমাকে খুঁজতে আমার হয়রানি হবে ঠিকই, তবে ধরা তুমি পড়বেই। তখন মৃত্যু ছাড়া তোমার কিন্তু আর অন্য কোনও গতি নেই।"

"জানি।" অরুণাশ্ব ফোঁস করে শ্বাস ফেলল, "আপনি আমার প্রভু, আমি আপনার দাসানুদাস। আপনি যেভাবে রাখবেন সেভাবেই আমি থাকব!"

boiRboi.net

জীবদত্ত কয়েক লহমা নীরব থেকে বললেন, "তোমাকে কীজন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তুমি জানো ?"

"আজ্ঞে না।"

"জানার কৌতূহল হচ্ছে না ?"

আবার একটা নিশ্বাস গড়িয়ে এল অরুণাশ্বর বুক থেকে, "না, স্পৃহা নেই। আমি শুধু বেঁচে থাকতে পারলেই খুশি।"

জীবদত্তর ঠোঁটের কোণে বিচিত্র হাসিটা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। দু'দিকে মাথা নাড়লেন জোরে জোরে। সিঁড়ির দিকে এগোতে গিয়েও ফিরে এলেন। আলগা হাত বোলালেন অরুণাশ্বর কপালে, "এখানে ঘা হয়ে গেছে দেখছি!"

একটামাত্র সহানুভূতিমাখা বাক্য। তাতেই অরুণাশ্বর বুকটা যেন তোলপাড় হয়ে গেল। কতদিন পর কেউ একটু নরম করে কথা বলল!

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল অরুণাশ্ব।

যাত্রাপুরে পৌঁছতে-পৌঁছতে সন্ধে নেমে গেল।

ঘাটের কাছেই ছোটমতন বাজার আছে একটা। দোকানপাটও আছে কিছু। কাপড় গামছা, বাসনকোসন, মিঠাই মণ্ডার। আরও কয়েকটা নৌকো ভিড়েছে ঘাটে, টিমটিম লণ্ঠনের আলোয় টুকিটাকি সওদা সারছে ব্যাপারিরা।

জীবদত্ত আর অরুণাশ্ব বাদে এ-নৌকোরও সকলে ঘাটে নেমে পড়েছে। চার সৈনিক ঘুরে ঘুরে হাত-পা ছাড়াচ্ছে। মাঝিমাল্লারা যাত্রার রসদ সংগ্রহে ব্যস্ত। বিরোচন যথারীতি দোকানে দোকানে গিয়ে হাঁকডাক করছেন। মিঠাই মণ্ডার দোকানের দিকে লোভী লোভী চোখে তাকিয়ে আছে বামুনঠাকুর। নৌকোয় ওঠার পর থেকে বামুনঠাকুরের খাওয়া ছাড়া আর কোনও কাজ নেই।

boiRboi.net

বাবা-মার দেওয়া নামটি নাকি তার বৃকোদর। আহা, সার্থক নামই বটে! শক্তিতে না হোক, ভোজনে সে ভীমের থেকে কম যায় না।

যাত্রাপুরে রান্নাবান্না করে খাওয়াদাওয়া সারতে অনেকটা সময় লেগে গেল। নৌকো ছাড়ল সেই মাঝরাতে। চাঁদমাঝি রাতটুকু যাত্রাপুরেই থাকার কথা আর-একবার তুলেছিল বটে, বিরোচনের গর্জনে জোয়ার আসতেই রওনা হতে হল। চলন্ত নৌকোর দুলুনিতে বিরোচনের নাকি ভাল ঘুম হয়।

পদ্মাবতীর খাল সত্যিই বেশ বিপদসঙ্কুল। দু' ধারে লোকালয়ের চিহ্নমাত্র নেই, যখন-তখন জলদস্যুরা হানা দেয়। গোদের ওপর বিষফোড়া, সরু নদীতে মাঝে মাঝে চোরা ঘূর্ণিও আছে। মাছধরার নৌকোরাও পারতপক্ষে এ-পথে রাতবিরেতে পাড়ি দেয় না। বিরোচনের কপাল ভাল, বিনা অঘটনে রাতটা কেটে গেল।

সক্কাল হতে-না-হতেই ধুন্ধুমার। বিরোচন রেগে কাঁই, নৃত্য জুড়ে দিয়েছেন নৌকোয়। কী? না, যাত্রাপুরের দোকানিদের ওপর হম্বিতম্বি করে গতকাল বিনি পয়সায় এক হাঁড়ি মণ্ডা বাগিয়েছিলেন, হাঁড়িটি তার ঘর থেকে উধাও হয়ে গেছে। খোঁজ খোঁজ খোঁজ। এক সৈনিক খবর দিল সে নাকি বৃকোদরকে রসুইঘরের সামনে দাঁড়িয়ে থাবা চাটতে দেখেছে। বৃকোদরকে চেপে ধরতেই সে বেমালুম অস্বীকার করল। তেত্রিশ কোটি দেবতার দিব্যি কেটে চিৎকার করে বলতে লাগল, সে পেটুক হতে পারে, গরিব হতে পারে, কিন্তু চোর নয়। চোর হওয়ার ইচ্ছে থাকলে সে নাকি রাজকর্মচারীর চাকরিই নিতে পারত। হইহই কাণ্ড। শেষে অবশ্য হাঁড়িটি বিরোচনের ঘরেই পাওয়া গেল। তাঁর ছাড়া পোশাকের আড়ালে সেটি লুকিয়ে ছিল।

boiRboi.net

এভাবেই হরেক নাটক চলতে লাগল দিনভর। বিরোচন একাই একশো, তিনিই মাতিয়ে রেখেছেন নৌকো। কখনও হেঁড়ে গলায় শিবের আরাধনা করছেন, কখনও কারণে অকারণে টুসকি বাজাচ্ছেন, কখনও বা শুধু শুধু অরুণাশ্বকে মুণ্ডু নামিয়ে দেবেন বলে শাসিয়ে আসছেন। এই শূন্যে তলোয়ার ঘোরাচ্ছেন, তো এই জেলেডিঙি থামিয়ে মাছ ভেট নিচ্ছেন। তাঁর সৈনিকরাও কম যায় না, বৃকোদরের পেছনে সারাদিন তারা লেগে আছে।

আরও দুটো দিন চলে গেল। চৈত্রের বাতাস কেটে কেটে তরতর এগোচ্ছে নৌকো। দেখতে দেখতে দেওপাড়া পার হয়ে গেল। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই পদ্মাবতীর খাল থেকে ভাগীরথীতে পড়বে। কর্ণসুবর্ণ বড় জোর আর দেড় দিনের পথ। দিনের আকাশে আগুন ছড়ায় সূর্য, আঁধার নামলে রাত ভারী মায়াময় হয়ে যায়। কৃষ্ণপক্ষ চলছে, চাঁদ একটু একটু করে ছোট হচ্ছে রোজ। আকাশ ছেয়ে থাকা তারারা উজ্জ্বলতর হচ্ছে প্রতিদিন। মিষ্টি একটা হাওয়া বয় সন্ধে থেকে, সারাদিনের তাপ জুড়িয়ে যায়।

বৃকোদর এখন জীবদত্তর সঙ্গে সারাক্ষণ সেঁটে থাকে। অভাবী বামুনটাকে জীবদত্তর বেশ পছন্দই হয়ে গেছে। বিশেষ করে মণ্ডা-কেলেঙ্কারির পর থেকে। মোটামুটি ভাব জমে গেছে দু'জনের। বৃকোদর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনেছে ময়ূরাক্ষী আর অজয়ের মাঝখানে ঠিক কোনখানটিতে জীবদত্তর বাস। জীবদত্ত কথায় কথায় বলেছিলেন তাঁর গ্রামে মাত্র একজনই ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁদের শিবমন্দিরের পূজারি। মানুষটা অথর্ব, তিন কুলে তার কেউ নেই। শুনে বৃকোদর আহ্লাদে আটখানা। তার খুব ইচ্ছে জীবদত্তর গ্রামে গিয়ে ঘাঁটি গাড়ার, পরে সুযোগমতো বউ-বাচ্চাদের নিয়ে আসবে।

সেদিনও বিকেলে এই জল্পনা-কল্পনাই চলছিল।

বৃকোদর প্রশ্ন জুড়ল, "আচ্ছা বদ্যিমশাই, কর্ণসুবর্ণ থেকে আপনার বাড়ি পৌঁছতে ক'দিন লাগে ?"

জীবদত্ত বললেন, "তা ধরো, দু'দিনের কম তো নয়।"

"ময়ূরাক্ষী থেকে আপনার বাড়ি তো বললেন অনেক দূর। অতটা পথ কি হাঁটতে হবে ?"

"হ্যাঁ। তা আট-ন' ক্রোশ তো বটেই।"

"ওই ছেলেটাকে কি পায়ে বেড়ি বেঁধেই হাঁটাবেন ?"

"দেখি... একটা গোরুর গাড়ি যদি পেয়ে যাই..."

বৃকোদর আবার একটা কী প্রশ্ন করতে গিয়ে থেমে গেল। চাঁদমাঝি মাস্তুলের ওপর থেকে উত্তেজিতভাবে চেঁচাচ্ছে, "সাবধান, সাবধান। বাতাস উলটো দিকে বইছে গো। ঈশান কোণে মেঘ। এক্ষুনি পাল নামাও।"

নৌকো জুড়ে সামাল সামাল রব পড়ে গেল। ঝড় আসছে।

boiboi.net

চাঁদ নামে দিশারু হলেও সে-ই এই নৌকোর সেরা মাঝি। সচরাচর সে কিছুই করে না। প্রায় গোটা দিনটাই সে মাস্তুলের ডগায় চড়ে বসে থাকে। কিন্তু বিপদ এলে তার আসল মূর্তিটি চেনা যায়। চোখের পলকে নিজেই পাল গুটিয়ে ফেলল চাঁদ। প্রায় বানরের মতো তরতর নেমে এসেছে নীচে। তার চলনে-বলনে বেশ কর্তৃত্বের ভাব আছে, উঁচু গলায় সে নির্দেশ ছুড়ছে দাঁড়িদের। সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে গেছে দাঁড় চালানোর গতি, ছপছপ ছুটছে নৌকো। হাল ধরে বসে থাকা লোকটাকেও ঠেলে

সরিয়ে দিল চাঁদ, নিজেই বসেছে তার জায়গায়। ঝড়ের সময়ে নৌকোর গতিমুখ সে-ই একমাত্র ঠিক রাখতে পারে।

সৈনিকদের মুখে-চোখে উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট। বিরোচনও ঘাবড়েছেন বেশ। তাঁর দাপট নিভে গেছে, ঘন ঘন তাকাচ্ছেন আকাশের দিকে। আকাশের উত্তর-পূর্ব কোণে ছোট্ট একখণ্ড কুচকুচে কালো মেঘ, বাচ্চা ভালুকের মতো। সেদিকেই নজর বিরোচনের। জলপথে মাঝে মাঝেই যাতায়াত করতে হয় তাঁকে, এই মেঘের স্বরূপ তিনিও চেনেন।

একমাত্র জীবদত্তই গুরুত্বটা এখনও বুঝে উঠতে পারছেন না। নৌকোয় এই হঠাৎ সাজো সাজো রব, মাঝিমাল্লাদের দৌড়োদৌড়ি হইহল্লা, তাঁকে যেন খানিকটা হতভম্ব করে দিয়েছে।

অবিশ্বাসের সুরে তিনি বৃকোদরকে জিজ্ঞেস করলেন, "এরা এত ভয় পাচ্ছে কেন বামুনঠাকুর ? ওইটুকু একটা মেঘে কী এমন ক্ষতি হবে ?"

বৃকোদরও ফ্যালফ্যাল তাকাচ্ছে, "সেটা তো আমারও মাথায় ঢুকছে না। তবে চাঁদ যখন বলছে....."

"আমার মনে হয় সবাই মিছিমিছি উত্তেজিত হচ্ছে। আমরা এত জন লোক আছি, এত বড় নৌকো....."

"বটেই তো। বটেই তো।"

বিরোচন কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ উত্তেজিত মুখে চেঁচিয়ে উঠলেন, "চুপ করুন তো আপনারা। নৌকোয় ক'বার যাতায়াত করেছেন ? নদীর ঝড় কাকে বলে জানেন ? চৈত্র মাসে হাওয়ায় কোনও ঠিকঠিকানা থাকে না। আর উলটো মুখ থেকে ঝড় এলে সে ভারী সর্বনেশে হয়। দেখছেন না, বাতাস একদম স্থির ? এ হল মহাঝটিকার পূর্বলক্ষণ।

জীবদত্তর তবু যেন ঠিক বিশ্বাস হয় না। হাল্‌কা ভাবে

boiRboi.net

বললেন, "এতই যখন জ্ঞান, নৌকো পাড়ে ভেড়াতে বলছেন না কেন ? ঝড় এসে চলে যাক, তার পর ধীরেসুস্থে রওনা হওয়া যাবে।"

"এই না হলে কবিরাজি বুদ্ধি ! দু'ধারে চোখ মেলে দেখেছেন ? কোথাও পাড় বলে কিছু আছে ?"

বিরোচন ভুল বলেননি। ভাগীরথী কাছাকাছি এসে গেছে বলে নদী এখন আর খালের আকারে নেই, প্রায় আধক্রোশটাক চওড়া। পদ্মাবতী এখানে দিক বদলাচ্ছে বারবার, পাড়ের দশা তাই খুবই খারাপ। নদীর দু'দিকের পাড়ই জল থেকে একেবারে খাড়াই উঠে গেছে। অনেকটা উঁচুতে। দূরে জঙ্গল মতন দেখা যায় বটে, কিন্তু তীরের আশপাশ একদম ন্যাড়া। গাছপালাহীন। অর্থাৎ নৌকো বাঁধার কোনও সুযোগই নেই।

একজন মাঝি দুড়দাড় পায়ে ছাদে উঠে এসেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "বাবুমশাইরা, আপনারা আর ওপরে থাকবেন না গো। এক্ষুনি নাও দুলতে শুরু করবে।"

এতক্ষণে জীবদত্ত শঙ্কিত হয়েছেন। নদীনালার দেশের মানুষ নন তিনি, নদীর ভয়ঙ্কর চেহারার সঙ্গে তাঁর তেমন চাক্ষুষ পরিচয় নেই। তাঁর কাছে নদী মানে ময়ূরাক্ষী। স্রোত আছে বটে, তবে সে ভারী শান্ত নদী। টলটলে জল। হেলেদুলে বয়। শীতের পর থেকে বর্ষার আগে অবধি তেমন জলও থাকে না সে নদীতে। তা ওই নদীতেও তিনি ক'বার নৌকো চড়েছেন কর গুনে বলে দেওয়া যায়। জন্মের মধ্যে কর্ম, এবার ত্রিবিক্রম শর্মার ডাকে বিক্রমপুর ছোটা। তাঁর বাপ-ঠাকুরদারা ত্রিবিক্রম শর্মার গৃহচিকিৎসক ছিলেন, তিনিও মনে মনে ভেবেছিলেন যাই একবার ঘুরেই আসি। শীতের শেষ, বল্লালসেনের রাজধানীটাও দেখা হবে, ত্রিবিক্রম শর্মার আতিথেয়তায় সময়ও কাটবে চমৎকার।

এখন মনে হচ্ছে কাজটা গোখ্‌খুরি হয়ে গেছে। সামনের এই পদ্মাবতী অতল গভীর। দেখলে গা-ছমছম করে। ভালয় ভালয় এখন ফিরতে পারলে হয়। বিপদের ওপর বিপদ, তিনি সাঁতারটা পর্যন্ত জানেন না। ছোট থেকে বাবার পায়ের কাছে বসে চিকিৎসাশাস্ত্র না পড়ে আর পাঁচজনের মতো সাঁতার শিখে নিলে ভাল হত।

মাঝি নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিরোচন সিঁড়ির দিকে দৌড়েছেন। দেখাদেখি বৃকোদর জীবদত্ত। ঈশান কোণের মেঘ এগিয়ে আসছে, ফুলে ফেঁপে উঠছে ক্রমশ। ডুবন্ত সূর্যকে বড় করুণ দেখাচ্ছে এখন। আলো মরে আসছে। নীচের পাটাতনে কোলাহল হচ্ছে খুব। চাঁদমাঝি মাঝে মাঝে জোরে হেঁকে উঠছে, আরও বেড়ে যাচ্ছে দাঁড়ের আওয়াজ।

একটা দমকা হাওয়া ছুটে এল কোত্থেকে। ক্ষণিকের জন্য টালমাটাল হয়ে গেল নৌকো। আবার ছুটছে দ্রুত।

জীবদত্ত ভয়ে ভয়ে বলে উঠলেন, "ও বামুনঠাকুর, আপনি সাঁতার জানেন ?"

বৃকোদর এর মধ্যেও রসুইঘরের দিকে উঁকি মারছিল। দিব্যি কেমন নির্বিকার ভাবে বলল, "শিখেছিলাম ছোটবেলায়। এখন বোধ হয় ভুলে গেছি।"

"যাহ্, সাঁতার একবার শিখলে কেউ ভোলে নাকি ?"

"কী জানি ! হয়তো জলে পড়লে মনে পড়ে যাবে।"

"বলতে তোমার বুক কাঁপছে না ?"

"কাঁপছে তো। হাত-পা পেটে সেঁধিয়ে যাচ্ছে।" বলেই জোরে নাক টানল বৃকোদর, "এখনও তো চুলো ধরায়নি দেখছি। আজ কি রাতে রান্না হবে না ?"

বিরোচন সৈনিকদের কী যেন বলছিলেন। কথাটা কানে

boiRboi.net

যেতেই কটমট করে তাকালেন, "খাওয়ার চিন্তা ভুলে যাও। সাঁতরে পাড়ে যেতে পারবে ?"

"না পারলে টুপুস করে ডুবে যাব। বৃকোদর হাত ওলটাল, "মরতে আমার ভয় নেই সেনাপতিমশাই। শুধু একটাই দুঃখ। বামনিটা আমার খুব কাঁদবে।"

বিরোচন খেঁকিয়ে উঠলেন, "কেউ তোমার জন্য কাঁদবে না। তুমি ডুববেও না। তোমার ওই নেয়াপাতি ভুঁড়িটা তোমায় ভাসিয়ে রাখবে।"

"তাই তো ভুঁড়িটাকে আরও ফুলিয়ে নিতে চাইছি।" বৃকোদর পেটে হাত বোলাল। মিটিমিটি হেসে বলল, "তা আপনি তো রাজার সৈনিক। আপনি নিশ্চয়ই সাঁতারে পটু ?"

"তাতে তোমার কী দরকার হে ?" দপ করে জ্বলে উঠেই দপ করে নিভে গেলেন বিরোচন, "এ নদীতে সাঁতার জেনেই বা কী লাভ ! কত কুমির কামট আছে...."

"কুমির কামট আপনার কী করবে ? কোমরে তলোয়ার আছে, কুচ কুচ করে তাদের কেটে উড়িয়ে দেবেন।"

এবার আর মাথার ঠিক রাখতে পারলেন না বিরোচন। চেঁচিয়ে গালমন্দ শুরু করেছেন, "আমার সঙ্গে রসিকতা হচ্ছে, অ্যাঁ ? অলক্ষুনে বিটলে বামুন কোথাকার ! ব্যাটা নৌকোয় উঠেছে বলেই এই বিপদ। ওর বউটাকে সাপে কাটুক। ছেলেপিলেগুলো গাছ থেকে পড়ে মরুক....."

জীবদত্তর কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছিল। আসন্ন বিপদের সময়ে এরকম অশান্তি কার ভাল লাগে ! পায়ে পায়ে দাঁড়িদের দিকে সরে গেলেন। চোখ পড়ল অরুণাশ্বর ওপর। ঝপাং ঝপাং দাঁড় টেনে চলেছে অরুণাশ্ব। চারদিকের এত হট্টগোলের মাঝেও ছেলেটা কী আশ্চর্য রকমের নীরব ! শুধু হাতের শক্ত পেশিগুলো

boiRboi.net

তার ওঠানামা করে চলেছে। গলগল ঘামছে ছেলেটা। জীবদত্তর উপস্থিতি টের পেয়ে বারেকের জন্য চোখ তুলল, আবার মন দিয়েছে নিজের কাজে। অদ্ভুত, ছেলেটার মুখে এতটুকু ভয়ের চিহ্ন নেই!

আবার একটা দমকা বাতাস ধেয়ে এল নৌকোয়। শিরশিরে ঠান্ডা বাতাস। নৌকো অনেকটা কাত হয়েই ফের সোজা হল। দুলছে জোর জোর। গোঁ গোঁ ডাকছে নদী। ঢেউ উঠছে উথাল পাথাল।

বুকটা গুড়গুড় করে উঠল জীবদত্তর। অরুণাশ্বকে ভুলে টলমল ছুটেছেন চাঁদমাঝির দিকে। শোঁ শোঁ বাতাস একটানা আছড়ে পড়ছে চাঁদমাঝির গায়ে, তবু তার তিলমাত্র চাঞ্চল্য নেই। দৃঢ় হাতে ধরে আছে হাল।

চাঁদমাঝির পাশে গিয়ে জীবদত্ত ধপাস করে বসে পড়লেন, "ও মাঝি, ঝড় তো এসে গেল। এখনও মাঝনদী দিয়ে যাচ্ছ কেন?"

"আজ্ঞে, আর কী করতে পারি?" চাঁদমাঝির চোয়াল কঠিন।

"পাড়ের দিকে চলো।"

"গিয়ে লাভ।"

"যদি তেমন কিছু হয়, তাড়াতাড়ি পাড়ে উঠতে পারব সকলে।"

"আজ্ঞে না। পাড়ের কাছে ঢেউ বেশি, নাও সামাল দেওয়া মুশকিল।" বলে আকাশের দিকে তাকাল চাঁদ, "ঝড় আরও বাড়বে। চন্ডীপুরের ঘাট বেশি দূর নয়। তাড়াতাড়ি নাও চালালে এখনও সেখানে পৌঁছনো যেতে পারে।"

"বলছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এখন যা বাতাস তাতে নাও ওলটাবে না। আপনি শান্ত হয়ে ভেতরে গিয়ে বসুন।"

boiRboi.net

জীবদত্ত তবু অস্থির, "কিন্তু চাঁদ, চন্ডীপুরে পৌঁছনোর আগেই যদি ঝড় এসে যায় ? ঈশ্বর না করুন, তার আগেই যদি নৌকো ডুবে যায় ?"

"সে তবে গিয়ে কপালের লিখন।"

বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে। গুলির মতো বড় বড় ফোঁটা নেমে আসছে শূন্য থেকে। গায়ে বিঁধে যাচ্ছে। সঙ্গে দামাল হাওয়া শব্দ বাজাচ্ছে শোঁ শোঁ।

জীবদত্ত ঠকঠক কেঁপে উঠলেন। নিজের সামাজিক মর্যাদা ভুলে অসহায় স্বরে ডুকরে উঠলেন, "নৌকো ডুবলে আমি মরে যাব চাঁদ। আমি যে সাঁতার জানি না। কী হবে ? ঘরে আমার স্ত্রী মেয়ে সবাই যে পথ চেয়ে বসে আছে।"

বিনীত বাধ্য চাঁদমাঝি হঠাৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। একেবারে অন্যরকম গলায় বলে উঠল, "মরতে আপনার এত ভয় বদ্যিমশাই ? নাও যদি সত্যিই ডোবে, যারা সাঁতার জানে তারাও কি সবাই বাঁচবে ? ওই যে দেখছেন....."

চাঁদের কথা শেষ হওয়ার আগেই প্রকান্ড এক ঢেউ লাফিয়ে এসেছে নৌকোয়। পাটাতন জলে জলময় হয়ে গেল। কাঠ আঁকড়ে ধরে থাকা জীবদত্ত ভিজে একাকার। মাত্র একটুক্ষণ আগের স্থিতধী মানুষটাকে আর চেনাই যাচ্ছে না। কাঁদো কাঁদো গলায় বলে উঠলেন, "অন্যের কথা বুঝি না, আমাকে বাঁচাও। তোমার পায়ে পড়ি চাঁদ, নৌকো পাড়ে নিয়ে চলো।"

"শুধু নিজের কথাটাই ভাবলেন বদ্যিমশাই ? অপরের প্রাণ বাঁচানোই না আপনার কাজ ?" চাঁদ এবার প্রায় ধমকে উঠল, "ওই যে ছেলেটাকে নিয়ে যাচ্ছেন, নাও ওলটালে তার কী দশা হবে ভেবেছেন ? অমন চৌখস ছেলে সাঁতার জেনেও ডুবে মরবে। কোন্ মৃত্যুতে কষ্ট বেশি ? সাঁতার জেনে ডোবা ? না কি সাঁতার না

জেনে ডোবা ?"

"তো আমি কী করব ? পায়ের বেড়ি খুলে দিলে ও যদি পালিয়ে যায় ?"

"পালালে পালাবে। সেটা তার ধর্ম। তাই বলে একটা জ্যান্ত মানুষকে আপনি ডুবিয়ে মারবেন ?" চাঁদের কণ্ঠস্বর আকাশের মেঘের মতোই গমগম করছে, "কেন কথাটা বলছি জানেন বদ্যিমশাই ? মাঝির কাজ করা আমার বংশগত পেশা নয়। আমার ঠাকুরদাদা, তাঁর বাবা, সবাই ছিলেন কৈবর্তরাজের সৈনিক। বরেন্দ্রভূমির কৈবর্তরাজ, যাঁরা যুদ্ধে পালরাজাদেরও হারিয়ে দিয়েছিলেন। কৈবর্তরাজ দিব্য, তারপর রাজা রুদোক, তারপর রাজা ভীম, এঁদের হয়ে লড়াই করেছেন আমার পূর্বপুরুষ। শেষে রামপালের কাছে হেরে গেলেন রাজা ভীম, রামপাল তাঁকে মেরে ফেললেন। সঙ্গে আমার ঠাকুরদাদারাও...। শুধু তাই নয়, আমার বাবার তখন তেইশ বছর বয়স, রামপালের সৈনিকরা তাঁকেও শিকলে বেঁধে গঙ্গায় চুবিয়ে মারল। যেমন আপনি মারতে চলেছেন। আমার শরীরে সৈনিকের রক্ত, এ আমি সইতে পারি না।

জীবদত্ত চাঁদমাঝির হাত আঁকড়ে ধরেছেন, "আমি তোমার সব কথা শুনব চাঁদ। তুমি খালি দয়া করে নৌকোটা পাড়ে নিয়ে চলো।"

নৌকোর অভিমুখ বুঝি ঘুরল সামান্য। কোনওক্রমে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেন জীবদত্ত, পারলেন না। হাওয়ার ধাক্কায় আছড়ে পড়ছেন। কুচকুচে কালো মেঘে গোটা আকাশ ঢেকে গেছে, জলের রংও ঘন কালো। নদী ফুঁসছে, ফুঁসে ফুঁসে উঠছে। হাওয়ার গর্জনের সঙ্গে তার হুঙ্কার মিশে গিয়ে হাড় হিম করে দিচ্ছে জীবদত্তর। ক্রমাগত জল উঠছে পাটাতনে, সৈনিকরা হাঁড়ি-কড়া

boiRboi.net

যা পাচ্ছে তাই দিয়ে সেঁচে ফেলছে সেই জল। এই ডান দিকে হেলে পড়ে নৌকো, তো এই বাঁয়ে। তারই মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে এগোলেন জীবদত্ত। নৌকোয় আলো নেই, আঁধারেই ঠাহর করে করে অরুণাশ্বর কাছে পৌঁছেছেন।

আন্দাজে গায়ে হাত রাখলেন, "কে তুমি ? অরুণাশ্ব ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

অরুণাশ্বকে আঁকড়ে ধরে সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করলেন জীবদত্ত। মৃত্যুর আতঙ্কের মাঝেও চাঁদমাঝির কথাগুলো বাজছে তাঁর কানে। তিনি খুব দয়ালু মানুষ নন, তবু কেমন যেন একটা অপরাধবোধ আসছে। ছেলেটাকে তিনি মেরে ফেলতেই পারেন, ও মরে গেলেও তাঁর কিছু যায় আসে না, কিন্তু এই ভাবে ? এত হীন মৃত্যুই কি ছেলেটার কপালে লেখা আছে ?

ভিজে ধুতির খুঁট থেকে চাবি বার করলেন জীবদত্ত। অরুণাশ্বর হাতে গুঁজে দিলেন চাবিটা।

অরুণাশ্বর দাঁড় টানা মুহূর্তের জন্য থেমে গেল, "এটা কী ?"

"তোমার পায়ের শিকলের চাবি। নিজেকে খুলে নাও।"

ঝোড়ো তান্ডবের মাঝেও এক সৈনিক মশাল জ্বালানোর প্রাণপণ চেষ্টা করছে। জ্বলে উঠেও নিভে যাচ্ছে মশাল। পলকের জন্য অরুণাশ্বর মুখটা দেখতে পেলেন জীবদত্ত। চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে ছেলেটার।

কেন করছে ? কৃতজ্ঞতায় ? পালাতে পারবে সেই খুশিতে ? প্রাণে বেঁচে যাওয়ার আনন্দে ?

চিন্তা করারও এতটুকু অবকাশ পেলেন না জীবদত্ত। হঠাৎই হাওয়ার গর্জন লক্ষগুণ বেড়ে গেল। হাজার-হাজার বুনো হাতি যেন একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল নৌকোর ওপর। কে যেন শূন্যে তুলে আছাড় মারছে নৌকোটাকে। কোথায় যেন আর্তনাদ করে

boiRboi.net

উঠলেন বিরোচন। কী একটা শক্ত পাতে ঠাং করে জীবদত্তর মাথা ঠুকে গেল।

সব অন্ধকার। জীবদত্ত জ্ঞান হারালেন।

কালবৈশাখী ঝড় আসে বড় তাণ্ডব মূর্তিতে, তবে মিলিয়ে যেতেও তার খুব একটা সময় লাগে না। রাত ঘন হওয়ার আগেই আকাশ পরিপূর্ণ মেঘহীন হয়ে গেল। অসংখ্য তারা হিরের কুচির মতো ফুটে উঠেছে আকাশে। জ্বলছে-নিভছে জ্বলছে। আকাশের রং এখন টলটলে গাঢ় নীল। ঠিক নীলও নয়, কালো আর নীল মেশা এ এক অপরূপ বরন। একটু আগেও যে ভয়ঙ্কর ঝড়টা হয়ে গেল তার আর চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। উঁহু আছে। শান্ত হয়ে যাওয়া নদীর পাড়ে ইতিউতি ভাঙা ডালপালা, উপড়োনো গাছ, কাঠিকুটি। পায়ের নীচে টলটল করছে কাদা।

অরুণাশ্ব ঝুঁকে পড়ে জীবদত্তকে দেখছিল। ভিজে মাটিতে পড়ে আছেন জীবদত্ত। এখনও তাঁর পুরোপুরি জ্ঞান ফেরেনি। মাঝে-মাঝে উঃ আঃ শব্দ করছেন, আবার নেতিয়ে পড়ছেন। অরুণাশ্ব কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। রোগাসোগা মানুষটাকে তীরে টেনে আনতে তার খুব একটা অসুবিধে হয়নি। বরং মানুষটা অজ্ঞান ছিলেন বলেই তাঁকে এক হাতে জাপটে ধরে জলের সঙ্গে লড়াই করতে করতে পাড়ে পৌঁছে গেছে। এবার তার কী করা উচিত ?

অরুণাশ্ব চাপা স্বরে ডাকল, "বদ্যিমশাই ?"

সাড়া নেই।

"ও বদ্যিমশাই, শুনছেন ?"

এবারও কোনও সাড়া নেই।

আরও ঝুঁকে জীবদত্তকে আলগা ঠেলতে গিয়ে অরুণাশ্ব চমকে উঠল। মানুষটার কপালে কী চটচট করছে ? রক্ত ? সাবধানে হাত ছোঁয়াল অরুণাশ্ব। এ হে, এ যে অনেকটা কেটে গেছে! কিছুক্ষণের জন্য রক্তপাত বোধ হয় বন্ধ ছিল, আবার শুরু হয়েছে।

ঝটিতি কর্তব্য স্থির করে ফেলল অরুণাশ্ব। হ্যাঁচকা টানে পরনের কাপড় থেকে ছিঁড়ে নিল খানিকটা। থেবড়ে বসে জীবদত্তর মাথা তুলে নিয়েছে কোলে। ফেট্টি করে বাঁধছে কাপড়খানা।

তখনই আবার জীবদত্তর গোঙানি শোনা গেল, "মাগো !"

অরুণাশ্ব উৎসুক মুখে জিজ্ঞেস করল, "কী কষ্ট হচ্ছে বদ্যিমশাই ? ... ও বদ্যিমশাই ?"

কষ্ট করে জীবদত্ত চোখ খুললেন, "কে ?"

"আজ্ঞে আমি। অরুণাশ্ব। আপনার সেবক।"

"আমি কোথায় ?"

"আজ্ঞে, আপনি পাড়ে শুয়ে আছেন।"

একটু বুঝি নাড়া খেলেন জীবদত্ত। অরুণাশ্বর হাত আঁকড়ে ধরে উঠে বসার চেষ্টা করছেন। পারছেন না। অরুণাশ্বই তাঁকে আলতো করে তুলে বসাল।

জীবদত্ত ঘোলাটে চোখে তাকাচ্ছেন এদিক-ওদিক। কৃষ্ণপক্ষের রাত, চাঁদ এখনও ওঠেনি, বেশি দূর অবধি স্পষ্ট দেখা যায় না।

ভয়ার্ত গলায় জীবদত্ত প্রশ্ন করলেন, "আমাদের নৌকো

pathagar.net

কোথায় ?"

"ডুবে গেছে।"

"মাঝিমাল্লারা ? আর সবাই ?"

"আজ্ঞে, জানি না। ধারেকাছে কাউকে তো দেখছি না। আমি স্রোত ধরে ধরে আপনাকে নিয়ে..."

"তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ ?"

অরুণাশ্ব চুপ করে রইল। পৃথিবী বড় আজব জায়গা, এখানে কে যে কাকে কখন বাঁচায়! বদ্যিমশাই তার হাতে বেড়ি খোলার চাবি না দিলে সে নিজেই তো এতক্ষণে কোথায় তলিয়ে যেত। কোনও মানুষের কোনও ভাল কাজই বৃথা যায় না। তাই হয়তো বদ্যিমশাইও বেঁচে গেলেন।

জীবদত্ত কাঁপা-কাঁপা হাত নিজের কপালে রেখেছেন, "উফ, বড় যন্ত্রণা।"

"আজ্ঞে, আপনার কপাল কেটে গেছে। বোধ হয় নৌকোতে আঘাত পেয়েছিলেন। ...শক্ত করে কাপড় বেঁধে দিয়েছি। রক্ত এখনও বন্ধ হয়নি।"

জীবদত্ত একটু একটু করে ধাতস্থ হচ্ছেন। বললেন, "কাছাকাছি কি কোথাও দূর্বাঘাস পাওয়া যাবে ?"

"দুব্বো ? দেখব ? ...আপনি একটু বসুন।"

বলেই তড়াং করে উঠে দাঁড়াল অরুণাশ্ব। অনেকদিন পর দামাল নদীর সঙ্গে হুটোপাটি করে তার শরীর এখন ভারী তরতাজা। অল্প-অল্প খিদে পাচ্ছে বটে, কিন্তু তার জন্যে দেহে-মনে কোথাও কোনও ক্লান্তি নেই। মিহি আঁধারে চোখও অনেকটা সয়ে এসেছে, অন্ধকারও আর তত গাঢ় লাগে না।

খানিক দূরে একটা ঝাঁকড়ামতো গাছ। নীচটা তার ঘাসে ছাওয়া। সেখান থেকে মুঠো ভর্তি ঘাস নিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে

boiboi.net

ফিরছিল অরুণাশ্ব, তখনই শুনতে পেল গলাটা। বিরোচনের গলা।

অরুণাশ্ব দাঁড়িয়ে পড়ল। সেনাপতিমশাইও তবে বেঁচে আছেন? কার ওপর এত হম্বিতম্বি করছেন? এখনও? এই সুনসান জায়গায়?

লোকটাকে নৌকোয় দেখার পর থেকেই একটুও পছন্দ হয়নি অরুণাশ্বর। মানুষকে যে মানুষ বলে মনে করে না, তার ছায়া মাড়াতেও অরুণাশ্বর ঘৃণা হয়। তবু এই মুহূর্তে সে অনুভব করল লোকটা বেঁচে আছে ভাবতে তার খুব ভাল লাগছে। যতই মন্দ হোক, বেঘোরে প্রাণ হারালে লোকটার প্রিয়জনদের কী দশা হত! আহা রে, নৌকোর আর সবাইও যেন এমন বেঁচে গিয়ে থাকে।

শব্দ লক্ষ্য করে অরুণাশ্ব পায়ে-পায়ে এগোল। বিশ-পঞ্চাশ হাত হেঁটেছে কি হাঁটেনি, ওমা, সামনে এক অদ্ভুত দৃশ্য। পাড় থেকে বেশ কিছুটা ভেতরে, এক ঝোপের ওপারে উঁচু ঢিবির মাথায় গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন বিরোচন, আর পেছন থেকে তাঁকে ক্রমাগত ঠেলে চলেছে বৃকোদর। অবিরাম ঠেলা খেয়েও নড়ছেন না বিরোচন। হাউমাউ চেঁচাচ্ছেন। আর তাই দেখে বৃকোদর হেসে কুটিপাটি।

অরুণাশ্ব চোখ রগড়াল। সত্যি দেখছে তো? ওরা জ্যান্ত মানুষ তো? না কি মাঝরাতে ভূত হয়ে খেলা করছে দু'জনে?'

চটকা ভাঙল বিরোচনের হুঙ্কারে, "অ্যাই, তুই কোত্থেকে রে? পালাচ্ছিস নাকি?"

অরুণাশ্ব থতমত মুখে বলল, "কই, না তো। ...আপনার গলা পেয়ে ভারী আনন্দ হল, তাই দেখতে এলাম।"

"চালাকি হচ্ছে? এক্ষুনি এক কোপে গলা নামিয়ে দেব।"

সঙ্গে-সঙ্গে বৃকোদর তিড়িং করে লাফিয়ে উঠেছে, "কী করে

boiRboi.net

boiRboi.net

নামাবেন ? আপনার তলোয়ার তো জলে ভেসে গেছে।"

কী আশ্চর্য, পলকে মিইয়ে গেলেন বিরোচন ! ভার ভার গলায় বললেন, "ভেসে যায়নি। কুমিরে টেনে নিয়ে গেছে।"

"যেমনভাবে আপনার পোশাক টেনে নিয়েছে, সেইভাবে ? হিহি হিহি।"

বিরোচন গুম। এতক্ষণ পর আকাশে ফালি চাঁদ উঠেছে, আলো বেড়েছে সামান্য। অরুণাশ্ব পরিষ্কার লক্ষ করল সত্যিই সেনাপতিমশাইয়ের যোদ্ধার বেশটি হাঁটুর পর আর নেই। তাই কি উঠতে চাইছেন না তিনি ? লজ্জা পাচ্ছেন ?

অহঙ্কারী মানুষটার দশা দেখে অরুণাশ্বর হাসি পেয়ে গেল। উচিত জব্দ। পরক্ষণে নিজের মনকে শাসন করল অরুণাশ্ব। গত ক'দিনের অভিজ্ঞতা তাকে শিখিয়েছে মানুষ অসহায় অবস্থায় পড়লে তাকে দেখে কখনও উল্লসিত হতে নেই। নিজের আজকের সুদিন অবলীলায় কাল দুর্দিন হয়ে যেতে পারে।

শান্ত স্বরে অরুণাশ্ব বলল, "বামুনঠাকুরের ঠাট্টা আপনি গায়ে মাখবেন না সেনাপতিমশাই। সঙ্কোচ না করে আমার সঙ্গে চলুন।"

বিরোচন মিনমিন করে বললেন, "কোথায় যাব ?"

"ওদিকে। ওখানে বদ্যিমশাই আছেন।"

"অ্যাঁ ? কবরেজটাও তবে বেঁচে গেছে ?"

কী ভাষা ! বিরক্তি সামলে অরুণাশ্ব বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে তাঁর মাথায় জোর চোট লেগেছে। খুব রক্ত পড়ছে। আমি তার জন্য দুব্বোঘাস..."

"তাই নাকি ? তবে তো গিয়ে দেখতে হয়।" বিরোচন উঠে দাঁড়িয়েছেন, "আমার সৈনিকগুলোর কী হাল হল কে জানে ! মনে হয় সব ব্যাটা টেঁসে গেছে।"

pathagar.net

বিরোচনের সব জড়তা উধাও, আবার ফিরে এসেছে সেই সর্দারি ভঙ্গি। থপ থপ হাঁটছেন তিনি। হাঁটুঝুল, গায়ে লেপটে থাকা পোশাকে তাঁকে প্রকাণ্ড ভাল্লুকের মতো দেখাচ্ছে। জীবদত্তর কাছে পৌঁছনোর পর তাঁর কথার স্রোত রোখে কে! সাত কাহন করে শোনাচ্ছেন কীভাবে তিনি নৌকো থেকে ঝাঁপ দিয়েছিলেন, নদীর ঠিক কোনখানটায় কুমির তাঁকে আক্রমণ করেছিল, কী অসম সাহসিকতার সঙ্গে সেই কুমিরের তিনি মোকাবিলা করেছিলেন ইত্যাদি। ইত্যাদি। বৃকোদর অবশ্য অরুণাশ্বর কানে-কানে অন্য কাহিনী শোনাল। বিরোচন নাকি সাঁতার জেনেও উত্তাল জলের সঙ্গে কিছুতেই এঁটে উঠতে পারছিলেন না, হাবুডুবু খাচ্ছিলেন খুব। বৃকোদরই তাঁর চুল ধরে টেনে তাঁকে পাড়ে নিয়ে এসেছে। কুমিরের গল্পটাও নাকি স্রেফ বানানো। জলের তোড়েই তাঁর পোশাক, কোমরবন্ধ সব ভেসে গেছে।

অরুণাশ্ব বুঝতে পারছিল না কার গল্পটা সত্যি। বৃকোদরের কি সত্যিই বিরোচনকে টেনে আনার মতো শক্তি আছে? না কি বিরোচনের তত সাহস আছে ওই উদ্দাম নদীতে কুমিরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারার? দু'জনের কারও গল্পকেই আমল না দিয়ে সে নেমে পড়ল জীবদত্তর শুশ্রূষায়। ঘাসগুলোকে দু'হাতে চেপে-চেপে থেঁতো করে নিল আগে, তারপর জীবদত্তর কপালের ফেট্টি খুলে ক্ষতস্থানে চেপে ধরল থ্যাঁতলানো ঘাস।

একটু পরে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেল।

মানসিক ধাক্কা কাটিয়ে ধীরে-ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছেন জীবদত্ত। টুকরোটাকরা কথাবার্তা বলছেন। বৃকোদরের সঙ্গে, বিরোচনের সঙ্গেও। তবে তাঁর শরীর এখনও খুব দুর্বল, রাতটা তিনি জেগে বসে কোনওমতে নদীর পারেই কাটিয়ে দিতে চান। চারজন মিলে

গল্পগুজব করলে ফুস করে রাত কেটে যাবে।

বিরোচন বাদ সাধলেন। বিপদ কেটে যাওয়ার পর তাঁর পেটে এখন চনচন করছে খিদে, এক্ষুনি তাঁর খাবার চাই। সেইমতো অরুণাশ্বর ওপর তাঁর হুকুম জারিও হয়ে গেল। তবে একা নয়, বৃকোদরকে সঙ্গে নিয়ে খাবারের খোঁজে যেতে হবে।

অরুণাশ্ব মহা ফাঁপরে পড়ে গেল। আমতা-আমতা করে বলল, "আজ্ঞে, এই রাতে কোথায় খাবার পাব? এদিকে কোথাও লোকালয় আছে কি না তাও আমি জানি না..."

"আলবত আছে। তুমি জানলেও আছে, না জানলেও আছে।" গর্জে উঠেও কী যেন একটা ধন্দে পড়ে গেলেন বিরোচন। সংশয়মাখা গলায় বৃকোদরকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা বামুনঠাকুর, আমরা নদীর কোন পারে আছি? এপারে, না ওপারে?"

"এপারে।" বৃকোদর ঝটপট জবাব দিল।

"উঁহু, এটা মনে হয় ওপার।"

"কী করে বুঝলেন?"

"আরে বাবা, এপার হলে তো মাঝিমাল্লাগুলোকে সব দেখতে পাওয়া যেত। অন্তত চাঁদ মাঝিকে। ও ব্যাটারা হল গিয়ে জলের পোকা, কোনও ঝঞ্ঝাই ওদের ডোবাতে পারবে না।"

"ঠিকই।" বৃকোদর মিটিমিটি হাসছে, "কিন্তু এমনও তো হতে পারে, আমরা এপারে উঠেছি, ওরাই ওপারে উঠেছে? কিংবা আমরা ওপারে উঠেছি, ওরা এপারে? আবার এও হতে পারে আমরা ওপারে উঠেছি, ওরাও ওপারে? আবার ধরুন এও হওয়া বিচিত্র নয়, আমরা ওরা সবাই এপারে উঠেছি, কিন্তু কোনও কারণে আমাদের দেখা হচ্ছে না? কিংবা ধরুন..."

"থাক থাক। আর ধরার দরকার নেই।"

"কেন, শুনুন না। এ হল গিয়ে ন্যায়শাস্ত্রের কথা। টোলে ছাত্রদের পড়াতাম কিনা এসব। ...ব্যাপারটাকে আমরা অন্যভাবেও দেখতে পারি। আমরা যদি ওপারে উঠেও থাকি, তা হলে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে ওপারটা এপার হয়ে গেছে, আর এপারটা ওপার। আর যদি এপারে উঠে থাকি তবে তো কোনও সমস্যাই নেই। এপারটা এপারই আছে, ওপারটা ওপার। অর্থাৎ আপনি কোনওভাবেই ওপারে উঠতে পারেন না। ঠিক কিনা?"

অরুণাশ্ব হাঁ করে বৃকোদরের আজব ব্যাখ্যা শুনছিল। হঠাৎ দূরে চোখ পড়েছে তার। আলো দেখা যাচ্ছে না? ওই মাঠের ওদিকে?

হ্যাঁ, আলোই। বিন্দুর মতো ফুটকি আলোটুকু দুলছে মৃদু মৃদু, অরুণাশ্বর চোখ সেদিকে স্থির। আলোটা কি একটু একটু করে বড় হচ্ছে? এগিয়ে আসছে কি? ওটা কি মশাল?

অরুণাশ্ব টান-টান হয়ে বসল। দেখাদেখি অন্যরাও।

এত গভীর রাতে কে আসে এদিকে!

আলো লক্ষ করে কয়েক পা এগিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল অরুণাশ্ব। সবিস্ময়ে লক্ষ করল আলোটা বেশ দ্রুত গতিতে কাছে আসছে। এদিকেই। এত রাতে মশাল হাতে কে আসে নদীতে?

কৌতূহলের নিরসন হল। মশালধারী একা নয়, তার পেছনে আরও দশ-বারোজন রয়েছে। ছায়া ছায়া অন্ধকারে সকলের মুখ পরিষ্কার বোঝা যায় না, তবে মশালধারীর অবয়ব স্পষ্ট। গাছের

boiRboi.net

গুঁড়ির মতো স্বাস্থ্য তার, কুচকুচে কালো রং, মাথাভরা ঝাঁকড়া চুল। চোখ দুটো ভাঁটার মতো, আগুনের আভায় দৃষ্টি তার দপদপ করছে।

সামনে পৌঁছেই লোকগুলো অরুণাশ্বদের গোল করে ঘিরে ফেলল। প্রত্যেকের হাতে লোহার দণ্ড, তার আগার দিক ছুঁচোলো। অনেকটা বল্লমের মতো।

বিরোচন গর্জন করে উঠলেন, "অ্যাই, তোমরা কে ?"

মশালধারী বিরোচনের একদম মুখের কাছটিতে চলে এল। বিচিত্র উচ্চারণে বলল, "তোমার সাহস তো কম নয়! আমাদের রাজ্যে দাঁড়িয়ে আমাদেরই প্রশ্ন করো!"

"ওরে বাবা, এ যে মেঘ মেঘ গলা!" অরুণাশ্ব মৃদু স্বরে প্রশ্ন করল, "কে তোমাদের রাজা ?"

"মহারাজ ঝম্পন। আমি মহারাজের সেনাপতি। হিড়িম।.....তোমরা কে ?"

বিরোচন বিরক্তিভরে বলে উঠলেন, "এমন মহারাজের নাম তো সাত জন্মে শুনিনি!"

দুই দণ্ডধারী হাঁ-হাঁ করে ছুটে আসছিল, হিড়িম তাদের হাত তুলে থামাল। কর্তৃত্বের সুরে বিরোচনকে বলল, "তোমরা কিন্তু এখনও নিজেদের পরিচয় দাওনি।"

বিরোচন আবার কী দম্ভ দেখিয়ে ফেলেন সেই ভেবেই বোধ হয় বৃকোদর এগিয়ে এসেছে। সংক্ষেপে নিজেদের সম্পর্কে জানাল, বিকেলের ঝড়েরও মোটামুটি একটা বিবরণ দিল।

হিড়িম শুনল মন দিয়ে, কিন্তু তার কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, "রাজা বল্লালসেন মল্লালসেন আমরা চিনি না। আমার অনুচর খবর দিল নদীতীরে নাকি মানুষ পড়ে আছে, তাই আমার আসা। রাজা ঝম্পনের হুকুম, তোমাদের নিয়ে

boiRboi.net

যেতে হবে।"

"হ্যাহ, তিনি বললেই যেতে হবে!" বিরোচন খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠলেন, "দরকার হলে তোমাদের রাজাকে ডেকে পাঠাও।"

হিড়িমের নাকের পাটা ফুলে উঠল। চারপাশের লোকগুলোও রে রে করে উঠেছে।

অরুণাশ্ব বুদ্ধি করে বলল, "না...মানে...যেতে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু সঙ্গে একজন বৃদ্ধ মানুষ রয়েছেন, তিনি সুস্থ নন, হাঁটতে পারছেন না...."

হিড়িম একটু বুঝি নরম হল। সরে গিয়ে তার অনুচরদের কী যেন নির্দেশ দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে এক বলশালী পিঠে তুলে নিয়েছে জীবদত্তকে।

বৃকোদর ফিসফিস করে বিরোচনকে বলল, "আর ট্যান্ডাই-ম্যান্ডাই করবেন না সেনাপতিমশাই। চুপচাপ চলুন। এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় ফলমূলেরও আশা নেই। এদের রাজার কাছে গেলে তাও কিছু জুটতে পারে।"

বিরোচন কঠোর চোখে তাকালেন বৃকোদরের দিকে, তবে আর কোনও মন্তব্য করলেন না। ক্ষিদেয় তাঁর এখন নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে যাওয়ার জোগাড়, এ-সময়ে খুব বেশি প্রতাপ দেখানোর ক্ষমতাও তাঁর আর নেই।

হাঁটা শুরু হল।

হিড়িম আগে আগে মশাল হাতে চলেছে, মাঝে অরুণাশ্বরা, তাদের ঘিরে বাকি লোকগুলো। হাঁটছে তো হাঁটছেই। হাঁটছে তো হাঁটছেই। একটা জঙ্গলমতো জায়গা পার হল, তার পর ধু-ধু মাঠ। তারও পরে ছোটখাটো এক বসতি দেখা গেল।

মশালে মশালে জায়গাটা বেশ উজ্জ্বল হয়ে আছে। চারধারে কয়েকটা মাটির ঘর। মাথাগুলো তাদের খড়ে ছাওয়া নয়, পাতায়

boiRboi.net

পাতায় ঢাকা। খানিক দূরে একটা টিলামতন রয়েছে, তার ওপরে একখানা বড়সড় কুঁড়েঘর। ঘরটার চূড়ায় রঙিন পতাকা উড়ছে।

বসতির মধ্যিখানে প্রকাণ্ড উঠোন। সেখানে অরুণাশ্বদের দাঁড় করিয়ে রেখে হিড়িম টিলার দিকে চলে গেল। এদিক-ওদিকের কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে এসেছে মানুষ। পিলপিল করে। ছেলেমেয়ে, বুড়োবুড়ির ভিড় লেগে গেছে রীতিমত। সবাই জুলজুল দেখছে অরুণাশ্বদের। কী যেন বলাবলি করছে, গা টেপাটিপি করছে, হাসাহাসি করছে। এদের বেশির ভাগেরই শরীরে তেমন কোনও কাপড়ের বালাই নেই, শুধু কৌপীনমতো পরা। মেয়েদের গায়ে পাতার পোশাক, হাতে মোটা-মোটা চুড়ি, কানে বিশাল লম্বা-লম্বা দুল। খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায় গয়নাগুলো সোনা রুপোর নয়, মাটির। এদের মধ্যে কেউ কেউ ছুঁয়ে দেখতে চাইছে অরুণাশ্বকে, বৃকোদরকে, এমনকী কিম্ভূতকিমাকার পোশাকের বিরোচনকেও। পাহারাদার লোকগুলো ঠেলে ঠেলে সরিয়ে দিল তাদের।

একটু পরে হিড়িম ফিরে এল। ঘোষণা করার ভঙ্গিতে বলল, "রাজা ঝম্পন এখন ঘুমোচ্ছেন। সকালে তাঁর সঙ্গে তোমাদের দেখা হবে।.....চলো, এখন তোমরা আমাদের কারাগারে থাকবে।"

কারাগার মানে আরেকটি পাতাছাওয়া কুঁড়েঘর। অন্য ঘরের সঙ্গে তফাত, ঘরটার চতুর্দিক দাওয়া ঘেরা এবং তার একটিই দরজা। কোনও জানলা টানলা নেই।

চার বন্দিকে ঘরে ঢুকিয়েই হিড়িম বেরিয়ে যাচ্ছিল, বৃকোদর তার হাত চেপে ধরল। মিনতিমাখা গলায় বলল, "ঘর তো একটা দিলেন যা হোক, এখন পেটের জন্য কি কিছু বরাদ্দ হয় না সেনাপতিমশাই?"

হিড়িম ভাবলেশহীন গলায় বলল, "কাল সকালে।"

"অতক্ষণ কি বাঁচব সেনাপতিমশাই ?"

"এক রাত না খেয়ে কেউ মরে না।"

"আপনার মতো দয়ালু মানুষ এ-কথা বলছেন ?" বৃকোদর তোষামোদের পথে গেল, "চারটে অসহায় অভুক্ত প্রাণীকে আহার দিলে সদাশিব আপনার মঙ্গল করবেন।"

নাহ্, হিড়িম দেখতে যতই ভয়ঙ্কর হোক, তার হৃদয়টি বোধ হয় নরম। সামান্য ভেবে নিয়ে বলল, "দেখছি।"

কাঠের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বাইরে থেকে হুড়কো টেনে দিল হিড়িম, আওয়াজ পেল অরুণাশ্ব। ভেতরটা নিঃসীম অন্ধকার, পাশে-বসে-থাকা মানুষকেও বোঝা যায় না। জীবদত্তর গলা থেকে অস্ফুট উঁ আঁ শব্দ বার হচ্ছে, শুনে শুনে অরুণাশ্ব সেদিকে গেল।

উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করল, "এখন কী কষ্ট হচ্ছে কবিরাজমশাই ? রক্ত তো বন্ধ হয়ে গেছে !"

"বেদ্‌না। বড় বেদ্‌না।" জীবদত্ত কষ্ট করে কথা বললেন, "দেহে কোনও বল পাচ্ছি না। আমার বোধ হয় আর গৃহে ফেরা হল না।"

"অমন ভাবছেন কেন ? আমি তো আছি সঙ্গে।"

জীবদত্ত বুঝি একটু ভরসা পেলেন। চুপ করে গেছেন।

ঘন আঁধারে বিরোচনের গলা বেজে উঠল, "সকালটা হোক, এদের রাজামশাইকে যদি আমি দেখে না নিই.... ! ওই হিড়িমটাকে আমি.... । এত বড় স্পর্ধা, রাজা বল্লালসেনের গণস্থ জেনেও তাকে এভাবে হেনস্থা করছে....."

"চুপ, চুপ।" বৃকোদরের সাবধানবাণী, "নির্ঘাত বাইরে কেউ পাহারায় আছে'।"

boiRboi.net

"আমি কাউকে ভয় পাই ? তলোয়ারটা যদি আমার নদীতে পড়ে না যেত তা হলে প্রথম দর্শনেই আমি হিড়িমের মুন্ডু নামিয়ে দিতাম।"

"আপনার তলোয়ার তো জলে পড়েনি। কুমিরে নিয়ে নিয়েছে। হিহি।"

"অ্যাই চোপ। এর মধ্যেও হাসি আসে ?"

দরজা খুলে গেল। মশাল হাতে হিড়িম, সঙ্গে দুটো লোক।

হিড়িম বলল, "তোমাদের কপাল ভাল। কিছুটা শূকরের মাংস

পেয়েছি, ভাগাভাগি করে খেয়ে নাও। সঙ্গে এটাও খাও, ভাল নিদ্রা হবে।"

ঝপ ঝপ গোটাকয়েক মাটির পাত্র নামিয়ে দিল লোক-দুটো। কিছু শালপাতাও। নিঃশব্দে হিড়িমের পেছন পেছন বেরিয়ে

অর্কপ্রভ দত্তগুপ্ত
732
বই নং
তারিখ
ফোন
7 MAY
boiRboi.net

গেল।

একটা ছোট পিদিমও রেখে গেছে। তার আলোয় খেতে বসেছে সকলে।

বিরোচন একটা বড়সড় মাংসের টুকরো মুখে ফেললেন। পলকে মুখ বিকৃত, "অ্যাঃ, এ যে কাঁচা মাংস!"

"কাঁচা কোথায়, ঝলসানো।" বৃকোদর নির্বিকার চিবোচ্ছে, "এখানে আপনি সুপক্ক মাংস পাবেন না, এইই খেয়ে নিন। বুঝতেই তো পারছেন, এরা আমাদের মহারাজকে আমল দেয় না। এরকম খুদে খুদে রাজায় বঙ্গদেশ এখন ভরে গেছে। নিজের নিজের অঞ্চলে এরা প্রত্যেকেই স্বাধীন। কোনওরকমে দেহরক্ষা করে এখন সকালবেলা ভালয় ভালয় কেটে পড়তে পারলে বাঁচা যায়।"

অরুণাশ্ব মুখে বুজে খাচ্ছিল। ঝলসানো একটু কম হয়েছে বটে, তবে মন্দ লাগছে না। আরেকটু নুন-ঝাল হলে আরও ভাল হত। জীবদত্ত অল্প ছিঁড়ে মুখে দিলেন মাত্র, আহারে তাঁর রুচি নেই। উপোসের অভ্যাস আছে তাঁর, না খেলেও কোনও অসুবিধে হবে না।

মাটির পাত্রে থকথকে পানীয়। সেটা মুখে তুলতে গিয়ে বিস্তর গোল বাধল। বিরোচন এক ঢোক খেয়েই ওয়াক ওয়াক করছেন। উৎকট গন্ধে অরুণাশ্বরও গা গুলিয়ে উঠল। সামান্য একটু জিভে ঠেকাল অরুণাশ্ব। এহ, কী বিশ্রী কষটে স্বাদ! বৃকোদর অবশ্য নাক টিপে চোঁ চোঁ শেষ করে ফেলল তার পাত্র।

জীবদত্ত দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসেছেন। প্রশ্ন করলেন, "কী ওটা?"

অরুণাশ্ব দু'দিকে ঘাড় দোলাল, "বুঝতে পারছি না। বিষটিষও হতে পারে।"

boiRboi.net

জীবদত্তর কেমন যেন কৌতূহল হল। মাটির পাত্র নাকের সামনে নিয়ে পরীক্ষা করছেন। মাথা নাড়াতে নাড়াতে বললেন, "খারাপ কিছু নয়। খেয়ে নিতে পারো। এটা ভাত পচিয়ে তৈরি। নেশার দ্রব্য, তবে কিছু খাদ্যগুণও আছে। ঘুম আসবে ভাল।"

জীবদত্তর কথা অমান্য করল না অরুণাশ্ব। খেয়ে ফেলেছে। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। সামনের সবকিছু দুলছে, কাছের মানুষগুলো আবছা-আবছা হয়ে এল।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, অরুণাশ্বর মনে নেই। চোখ খুলল হিড়িমের ডাকে। রাজা ঝম্পনের আহ্বান এসেছে, যেতে হবে।

টিলার ওপর এক পাথরের বেদিতে বসে আছেন রাজা ঝম্পন। প্রকাণ্ড এক শিমুল গাছের তলায়। তাঁরও পরনে কৌপীনের মতো পোশাক, কিন্তু গায়ে ঝালর দেওয়া জামা, মাথায় পালকের মুকুট, বেশ গাঁট্টাগোট্টা চেহারা তাঁর, মোটা গোঁফ আছে, গায়ের রং অন্যদের তুলনায় একটু কম কালো। তাঁর পাশেই এক লম্বা-দাড়ি কাপালিক, রক্ত বসন পরা, কপালে লাল তিলক।

রাজা আর কাপালিক নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলেন, অরুণাশ্বদের হাজির করা মাত্র খাড়া হয়ে বসেছেন। হিড়িমকে জিজ্ঞেস করলেন, "এদেরই কাল তবে নদীর পাড় থেকে তুলে এনেছ?"

হিড়িম ঝুঁকে প্রায় মাটিতে মাথা ছুঁইয়ে ফেলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, মহারাজ। আগডুমই ওদের প্রথম দেখেছে। রোজকার মতো সন্ধেবেলা নদীর দিকে পাহারায় গিয়েছিল, তখনই ওই বুড়ো আর ছোঁড়াটা ওর নজরে আসে। বাকি দু'জন পরে এসেছে। কাল বিকেলের ঝড়ে এদের নৌকোডুবি হয়েছে।"

রাজা ঝম্পন বিরোচনের দিকে তাকালেন, "শুধু তোমরাই

boiRboi.net

ছিলে ?"

বিরোচন উলটো দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। বৃকোদরই জবাব দিল, "আজ্ঞে না, রাজামশাই। অনেকে ছিল। মাঝিমাল্লা, সেপাই....."

"তারা সব গেল কই ?"

"বলতে পারব না।"

"খোঁজোনি ?"

"খোঁজ পাইনি।"

রাজা ঝম্পনের মুখে হাসি ফুটল। কাপালিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী মনে হয় গুরুদেব ? মা-চণ্ডিকাই কি এদের পাঠিয়েছেন ?"

কাপালিক দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, "আমারও তাই বিশ্বাস। এদের একজনকে দিয়েই তোমার কার্যোদ্ধার হবে।"

অরুণাশ্বরা কিছু বুঝতে পারল না। মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে কাপালিকের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হল। রাজা ঝম্পনকে অজর অমর করে দেওয়ার জন্য এক জটিল ইন্দ্রজালের প্রয়োগ করবে কাপালিক। ইন্দ্রজালের জন্য বিবিধ উপকরণ চাই। দাঁড়কাকের রক্ত, শেয়ালের পিত্ত, ভালুকের হাড়, পেঁচার ডানা, ঘোড়ার মুখের ফেনা। এই পাঁচটা জিনিস একসঙ্গে পিষে কাপালিক এক মহাবটিকা তৈরি করবে। মানুষের টাটকা ঘিলুতে

boiRboi.net

ভিজিয়ে সেই বড়ি গিললেই ব্যস, ঝম্পনের সঙ্গে যমরাজের আর কস্মিনকালে দেখা হবে না।

ওই টাটকা ঘিলুর প্রয়োজনেই নরবলি দেবে কাপালিক। আগামী অমাবস্যার রাতে। অর্থাৎ পরশু।

কাপালিকের সঙ্গে মহানন্দে খোলাখুলিভাবে সব কথাই আলোচনা করে চলেছেন রাজা ঝম্পন। কাপালিকও রসিয়ে-রসিয়ে উত্তর দিচ্ছে। একবার হিড়িমকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, বাকি সব উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছে কি না। হিড়িম চিন্তিত মুখে জানাল, পেঁচাটা এখনও পাওয়া যায়নি। তবে লোকলশকর বেরিয়ে পড়েছে, আজ রাত্রে যেমন করে হোক পেঁচা একটা ধরে ফেলা হবে।

শুনতে-শুনতে হৃৎকম্প হচ্ছিল অরুণাশ্বর। এ কোন উন্মাদের রাজ্যে এসে পড়ল তারা! মৃত্যুদণ্ড থেকে মুক্তি পেয়ে, ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে, শেষে কি এখানে বেঘোরে প্রাণ দিতে হবে! জীবদত্ত'ও ভয় পেয়েছেন খুব, ঠকঠক কাঁপছেন। বিরোচনের দু' চোখ বিস্ফারিত। একমাত্র বৃকোদরেরই তেমন কোনও হেলদোল নেই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাই তুলছে ক্রমাগত।

অরুণাশ্ব চাপা স্বরে প্রশ্ন করল, "আপনি এমন নির্বিকার হয়ে আছেন কী করে বামুনঠাকুর? আপনার কি প্রাণের আশঙ্কা নেই?"

"ভয় পেয়ে কী হবে বাপু! মানুষে মরতেই হবে।" আঙুল ঢুকিয়ে দাঁতের ফাঁক থেকে কাল রাতে খাওয়া মাংসের কুচি বের করল বৃকোদর, হাতের চেটোয় রেখে দু-এক মুহূর্ত নিরীক্ষণ করল। তারপর টোকা মেরে ফেলে দিয়ে বলল, "তবে কী জানো বাপু, নরবলির আগে উত্তম আহার করানোর প্রথা আছে। দুটো দিন বসে বসে বেশ ভালমন্দ খাওয়া যাবে। বনবাদাড়ে ফলপাকুড়

boiRboi.net

খুঁজে বেড়ানোর থেকে সেটা কি ভাল না ?"

লোকটার মাথায় কি ছিটেফোঁটা বুদ্ধিও নেই ? না কি বিষম ভয়ে বুদ্ধি লোপ পেয়েছে ? অনেক সময়ে মানুষ বিপদ অবশ্যম্ভাবী জেনে ভয় তাড়ানোর জন্য নিজের মতো করে সান্ত্বনা খোঁজে, বামুনঠাকুরও কি তাই করছে ?

হঠাৎ কাপালিক আর রাজার কথা থেমে গেছে। কী যেন ভাবছে কাপালিক। ভারী গলায় ডাকল, "হিড়িম !"

হিড়িম বল্লম দিয়ে পিঠ চুলকোচ্ছিল। চৈত্র মাসের কড়া গরমে বোধ হয় পিঠে ঘামাচি হয়েছে। ডাক শুনে দেহ তার একটু কেঁপে গেল, "আজ্ঞে গুরুদেব ?"

"বলি, চারটে মানুষ জোগাড় করেই কি তোমার কাজ শেষ ?"

"আজ্ঞে আর কী করতে হবে ?"

"চারটে মুণ্ডু তো আমার লাগবে না বাপধন। আমার তো দরকার একটা।"

"বলুন কোনটাকে নেবেন ?"

"সে কি আমার ইচ্ছেয় হবে ? মা চণ্ডিকা যাকে নির্দিষ্ট করে পাঠিয়েছেন, তাকেই আমার চাই।"

"তাকে কী করে চিনব গুরুদেব ?"

রাজা ঝম্পনের দিকে ফিরে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল কাপালিক, "এ সমস্ত লোক নিয়ে আপনি রাজ্য চালান ? নরবলির জন্য কী ধরনের মানুষ লাগে তাও এ জানে না !"

ঝম্পন ফ্যালফ্যাল চোখে তাকালেন, "আজ্ঞে, সে তো আমিও জানি না গুরুদেব।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনি রাজামশাই, আপনার সব কিছু না জানলেও চলবে। কিন্তু আপনার অনুচরদের তো জানা উচিত।"

boiRboi.net

রাজা ঝম্পন কটমট করে হিড়িমকে দেখছেন, পারলে বুঝি ভস্ম করে দেন। পরক্ষণে ভীষণ বিনীত গলায় কাপালিককে বললেন, "ওই নির্বোধকে আমি পরে শাস্তি দেব। এখন আপনি যদি দয়া করে কী করতে হবে বলে দেন..."

কাপালিক সামান্য প্রসন্ন হল। দু' চোখ বন্ধ করে বলল, "সর্বসুলক্ষণযুক্ত মানুষ চাই রাজামশাই।"

"কী কী লক্ষণ থাকলে সুলক্ষণ বলব গুরুদেব ?"

"অতি সহজ। হাত, পা, চোখ, মুখ, কান সব যথাযথ স্থানে থাকবে। দেহে কোনও কাটাছেঁড়া থাকবে না, আঘাতের চিহ্ন থাকবে না, টেকো বা মাকুন্দ হলে চলবে না..."

রাজা ঝম্পন গর্জন করে উঠলেন, "কী হিড়িম, শুনলে তো ? যাও, ওদের পরীক্ষা করো।"

হিড়িম হাঁকপাক করে দৌড়ে গেল। ঝটিতি অরুণাশ্বদের দেখে নিয়ে বলল, "আজ্ঞে, এদের সব অঙ্গই ঠিকঠাক জায়গায় আছে গুরুদেব।"

"হুম। তারপর ?"

হিড়িম একে একে চারজনেরই চুলে হাত বোলাল। গালেও। দেঁতো হেসে বলল, "চুল দাড়ি আছে গুরুদেব। শুধু এই বুড়োটার চুল যা একটু পাতলা। একে কি খুঁত বলা যায় ?"

"না। এবার শরীরে আঘাতের চিহ্ন খোঁজো।"

সোজা অরুণাশ্বর সামনে এসে দাঁড়াল হিড়িম। উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করল, "এর কপালে একটা ঘা আছে গুরুদেব। কী যেন লেখাও আছে মনে হচ্ছে। পড়ার চেষ্টা করব ?"

"থাক। বাতিল। পরের জনকে দ্যাখো।"

অরুণাশ্বর বুক থেকে একটা বড়সড় স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এল। এই প্রথম তার মনে হচ্ছিল কপালে দেগে দেওয়া উল্কি শুধু

অপমানের নয়, এর পেছনে কোনও অদৃশ্য শক্তির আশীর্বাদও আছে। কে সেই শক্তি ? তার মা ? না কি তার পরলোকগত বাবা ?"

হিড়িম জীবদত্তর সামনে। আবার ঘোষণা, "বুড়োটার কপালে এতটা কাটা গুরুদেব, এখনও রক্ত লেগে আছে।"

"ওটাও বাতিল। তৃতীয়টাকে দ্যাখো।"

হিড়িম বৃকোদরের কাছে যেতেই পিড়িং করে ঘুরে গেল বৃকোদর। আঙুলের ইশারায় পিঠটা দেখাল। সরু লম্বা দাগ।

মুচকি হেসে বৃকোদর বলল, "ছোটবেলায় আমগাছ থেকে পড়ে গিয়েছিলাম।"

অতঃপর সেও খারিজ। বিরোচনের সামনে দাঁড়িয়েছে হিড়িম। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছে বিরোচনের হাত, পা, বুক, পিঠ, কাঁধ, গলা...। উৎফুল্ল মুখে চেঁচিয়ে উঠল, "পেয়েছি গুরুদেব। এই লোকটার শরীরে একটাও খুঁত নেই।"

"এই যাঃ, হতেই পারে না।" বিরোচন শিউরে উঠে বললেন, "আমি কত যুদ্ধ লড়েছি জানো ?"

"তাই বুঝি ? চিহ্ন তো দেখা যায় না ?"

"বিশ্বাস করো, আছে।" বলতে-বলতে ছেঁড়াখোঁড়া যোদ্ধার পোশাকটি পেটের ওপর তুলেছেন বিরোচন। আতিপাতি করে পেটে-বুকে খুঁজছেন একটা দাগ। মাঝে-মাঝেই বিড়বিড় করে উঠছেন, "এই যাঃ, ওই দাগটা কোথায় গেল ! এ কী কাণ্ড, সেই দাগটা খুঁজে পাই না কেন !"

"থাক, থাক, আর খোঁজার দরকার নেই।" রাজা ঝম্পন হুকুম ছুড়লেন, "বাঁধ ব্যাটাকে, কষে বাঁধ।"

বৃকোদর ফুট কেটে উঠল, "আহাহা, কষে বাঁধবেন না। ওতে কিন্তু দাগ তৈরি হয়ে যেতে পারে।"

বিরোচন হাউমাউ করে বৃকোদরের দিকে তেড়ে গেলেন, "তবে রে বিটলে বামুন, আমাদের খেয়ে আমাদেরই সর্বনাশ চাস ! তোর একদিন কি আমার একদিন..."

বৃকোদর দৌড়চ্ছে, তার পেছনে বিরোচন, তাঁকে তাড়া করে হিড়িম আর তার দলবল। হইহই কাণ্ড। বৃকোদর সুড়ুত করে কাপালিকের পেছনে দাঁড়িয়ে পড়ল। বিরোচন আর সেদিকে যেতে পারছেন না, উলটো মুখে পাঁই-পাঁই ছুটছেন, রে রে করে তাঁকে তাড়া করছে হিড়িম। প্রকাণ্ড এক গুঁড়িঅলা শিংশপা গাছের নীচে এসে বিরোচনের দম বুঝি ফুরিয়ে গেল। আর এগোতে পারছেন না, কুকুরের মতো জিভ বের করে হাঁপাচ্ছেন। হিড়িম একদম কাছে এসে পড়েছে দেখে মরিয়া হয়ে গাছের গুঁড়ি ঘিরে গোল হয়ে ঘুরতে শুরু করলেন। হিড়িমও ঘুরে চলেছে সঙ্গে। এক পাক, দু' পাক, পাঁচ পাক, দশ পাক...। হিড়িমের অনুচররাও পৌঁছে গেছে। বল্লম দিয়ে খোঁচা মারার চেষ্টা করছে বিরোচনকে।

হিড়িম হেঁকে উঠল, "অ্যাই, তোরা সব সরে যা। আমি একাই ওকে ধরব। তোদের বল্লমের খোঁচা লাগলে ও খুঁতো হয়ে যাবে।"

বিরোচনের অবস্থা দেখে অরুণাশ্বর খুব খারাপ লাগছিল। ধনে অস্ত্রে ক্ষমতায় অত বলীয়ান হয়েও কেন মানুষটাকে হেনস্থা হতে হচ্ছে বারবার ? অসহায় মানুষদের মানুষ বলে গণ্য করেন না বলেই কি ? প্রাণ যাওয়ার ভয়ে কি কাতর হয়ে পড়েছেন বিরোচন ! আহা রে, মানুষটা যেন এ যাত্রা বেঁচে যান।

বিরোচনের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ। টলতে-টলতে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তাঁর ওজনদার দেহ কাঁধে নিয়ে বীরবিক্রমে ফিরে আসছে হিড়িমের দল। রাজা ঝম্পনের সামনে এনে তাঁকে শুইয়ে

pathagar.net

দিল। রাজা ঝম্পন নিচু হয়ে একবার দেখলেন বিরোচনের শ্বাসপ্রশ্বাস পড়ছে কিনা। নিশ্চিন্ত হয়ে হিড়িমকে আদেশ দিলেন, "একে আপাতত কারাগারেই রাখো।" বলেই অরুণাশ্বদের দিকে চোখ, "যাও, তোমরা মুক্ত। যেখানে খুশি চলে যেতে পারো।"

অরুণাশ্বর পা সরছে না। বিরোচনকে ফেলে তারা চলে যাবে? তাই কি হয়? একবার জীবদত্তর দিকে তাকাল, একবার বৃকোদরের দিকে। কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না, কথা আসছে না মুখে।

অরুণাশ্বকে অবাক করে দিয়ে বৃকোদরই হঠাৎ এগিয়ে এল। ঝম্পনের পায়ের কাছে বসে বলল, "রাজামশাই, যদি অভয় দেন তো একটা কথা বলি।"

ঝম্পনের মনে খুশি ফিরে এসেছে। হাসিমুখে বললেন, "বলে ফ্যালো।"

"আমাদের সেনাপতিমশাইয়ের মাথার ঘিলু আপনাকে অমর করবে, এ আমাদের পরম সৌভাগ্য। তাঁকে যখন বলি দেওয়া হবে, আমরা কি সেই মাহেন্দ্রক্ষণটিতে উপস্থিত থাকতে পারি না?"

রাজা ঝম্পন একটু ভাবলেন। তারপর কাপালিককে জিজ্ঞেস করলেন, "গুরুদেব, এরা থাকলে কি কোনও অসুবিধে হবে?"

"থাকতে চায় থাকুক।" অবহেলাভরে জবাব দিলেন কাপালিক।

বৃকোদর অরুণাশ্বর সঙ্গে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করল। জীবদত্তর ঠোঁটের কোণেও হাসির রেখা।

অনেকক্ষণ পর জীবদত্ত কথা বললেন, "আপনার প্রাণে অসীম করুণা রাজামশাই।"

রাজামশাই বেদি ছেড়ে উঠে পড়লেন। সঙ্গে কাপালিক।

boiRboi.net

দু'জনে এগোচ্ছেন উঁচু টিলার দিকে। চারজন লোক চ্যাংদোলা করে বিরোচনকে নিয়ে চলল কারাগারে।

সহসা গ্রামে কলরব। রাজা ঝম্পন দাঁড়িয়ে পড়লেন। ভুরু কুঁচকে কোলাহলের কারণ বোঝার চেষ্টা করছেন।

অরুণাশ্ব দেখতে পেল মুণ্ডিতমস্তক গেরুয়াধারী এক প্রবীণ সন্ন্যাসী রাজা ঝম্পনের কাছে এগিয়ে আসছেন। তাঁর পেছনে একদল গ্রামবাসী, ঝম্পনের প্রজা।"

টিলার নীচে এসে সন্ন্যাসী হাত তুললেন, "জয়, তথাগতর জয়।"

রাজা ঝম্পন দ্রুত নেমে এলেন। সন্ন্যাসীর সামনে করজোড়ে বললেন, "কী সৌভাগ্য, কী সৌভাগ্য! ভিক্ষু সুভদ্র আজ আমার রাজ্যে পা রেখেছেন!"

"আমার কথা আপনার মনে আছে রাজা?"

"কী যে বলেন! আপনাকে আমি ভুলতে পারি! আমার রাজ্যে যেবার ওলাওঠার মড়ক লাগল, আপনি যদি অন্য ভিক্ষুদের নিয়ে এসে প্রজাদের সেবা না করতেন, আমার রাজ্য তো উজাড় হয়ে যেত। ...আপনার রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের সব কুশল তো?"

"চলছে। জানেনই তো, কর্ণসুবর্ণর মহাসামন্ত বৌদ্ধদের প্রতি তেমন সদয় নন। নানারকম উৎপাত লেগেই আছে। আমরা এখন নগরে তণ্ডুল পর্যন্ত ভিক্ষা করতে যেতে পারি না।"

রাজা ঝম্পন ব্যথিত মুখে ঘাড় নাড়লেন, "হুম, শুনেছি। ... তা আপনি হঠাৎ এ-পথে যে?"

"পদব্রজে কোটালিপাড়ায় যাচ্ছিলাম। ওখানে আমাদের সঙ্ঘারামে প্রধান নিয়োগ নিয়ে কিঞ্চিৎ গোলযোগ চলছে, সমাধানের দায়িত্ব পড়েছে আমারই ওপর। ভাবলাম এদিক দিয়ে যখন যাচ্ছি, একবার আপনার খবর নিয়ে যাই।" কথার মাঝে

boiRboi.net

হঠাৎ টিলার ওপর দৃষ্টি গেল সন্ন্যাসীর। অদূরে দাঁড়ানো কাপালিকের দিকে আঙুল তুলে বললেন, "ওই লোকটি এখানে কেন রাজামশাই ?"

রাজা ঝম্পন জিভ কাটলেন, "লোকটা কী বলছেন ! উনি আমার গুরুদেব।"

সুভদ্রর কপালে ভাঁজ, "আশ্চর্য, ওই মহাপ্রবঞ্চক আপনার গুরুদেব !"

ঝম্পন থতমত খেয়ে গেলেন। চোখে স্পষ্ট অবিশ্বাস। আহত স্বরে বললেন, "আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি ভিক্ষু। আমার গুরুদেবের নামে আপনি যা-তা বলতে পারেন না।"

সুভদ্র সামান্য চুপ থেকে বললেন, "মানা, না মানা, আপনার ইচ্ছে। যা সত্যি, তাই আমি বললাম। ওকে আমি বিলক্ষণ চিনি। ও একটি নিচু শ্রেণীর ঠগ। আজ থেকে পনেরো বছর আগে কর্ণসুবর্ণ থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। কেন জানেন ? কর্ণসুবর্ণের এখন যিনি মহাসামন্ত, তাঁর বাবা প্রভুচন্দ্রের সঙ্গে ওই লোক ঘোর তঞ্চকতা করেছিল। অদৃশ্য হওয়ার মন্ত্র শেখাবে বলে সাত ঘড়া মোহর নিয়েছিল। তারপর কীসব খাইয়েটাইয়ে প্রভুচন্দ্রকে অজ্ঞান করে দিয়ে পালাচ্ছিল, সৈনিকরা তাকে তখন ধরে ফেলে। তারপর ওর মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে, গাধার পিঠে চড়িয়ে..."

সুভদ্র থামলেন। দৃঢ় পদক্ষেপে টিলায় উঠছেন। কাপালিকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, "তুমি কি অস্বীকার করতে পারো তুমি সেই প্রতারক গণেশ্বর ?"

কাপালিকের মুখ নিমেষে সাদা। কাটা কলাগাছের মতো আছড়ে পড়ল সুভদ্রর পায়ে, "আমায় ক্ষমা করে দিন। আপনি না মাফ করলে রাজামশাই আমায় ক্ষমা করবেন না। আমি মরে

boiRboi.net

যাব। আমি মরে যাব।"

অরুণাশ্বর মুখে হাসি ফুটে উঠল। এও কি সেই অদৃশ্য শক্তির লীলা? কে ঠিক এই মুহূর্তে এখানে পাঠাল ওই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে?

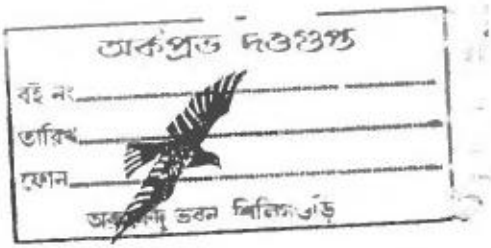

বিরোচন প্রাণে বেঁচে গেলেন। তবে তক্ষুনি তক্ষুনি অরুণাশ্বরা মুক্তি পেল না। রাজা ঝম্পন একটা দিন অন্তত অরুণাশ্বদের রাজ অতিথি করে রেখে নিতে চান। ভুলের প্রায়শ্চিত্ত। ভণ্ড কাপালিকের ওপর ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন রাজা ঝম্পন। খলটাকে হত্যা করারই ইচ্ছে ছিল তাঁর। শেষমেষ ভিক্ষু সুভদ্রর অনুরোধে তাঁকে শুধু বিতাড়িত করেই ক্ষান্ত হয়েছেন। সঙ্গে অবশ্য কড়া নির্দেশ জারি করতে ভোলেননি— সূর্যাস্তের পর আর কখনও আমার রাজ্যে দেখা গেলে তদ্দণ্ডেই যেন গণেশ্বরের গলা কুচুং করে কেটে নেওয়া হয়।

অতিথি সেবার আয়োজনও করলেন বটে রাজা ঝম্পন। শুয়োরের মাংস, হরিণের মাংস, রুই মাছ, আম জাম কাঠাল কলা, ক্ষীর, পিঁপড়ের ডিমের চাটনি। সঙ্গে কী এক ফুলের রসে তৈরি নেশার পানীয়। যে যত পারো খাও।

বিরোচনের মৃত্যুভয় কেটে গেছে। আর তাঁকে পায় কে। বৃকোদরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চর্বচোষ্যলেহ্যপেয় চলছে। জীবদত্তও এখন অনেকটা সুস্থ। তিনিও আজ আর কাল রাতের মতো উপোস করছেন না। বহুকাল পর মনের মতো সুখাদ্য পেয়ে

pathagar.net

অরুণাশ্বও মহা খুশি।

নিজের মৃত্যুদণ্ড অরুণাশ্বকে সকলের থেকে আলাদা করে দিয়েছিল, বিরোচনের মৃত্যুর আদেশ তাকে আবার যেন সবার সঙ্গে এক করে দিল। তিন সঙ্গীর সঙ্গে একাসনে বসে খাচ্ছে সে। মাঝে-মাঝে কথাও বলছে টুকটাক। হাসছে। এমনটা কি গত কালও কল্পনা করা গিয়েছিল!

ভোজের আসরে আছেন ভিক্ষু সুভদ্রও। তিনি অবশ্য বিশেষ কিছুই মুখে তুলছেন না। নিরামিষাষী মানুষ তিনি, ফলমূল ছাড়া অন্য খাদ্য গ্রহণ করেন না।

সন্ধেবেলা নাচ-গান শুরু হল। এই তাগড়াই চেহারার এক লোক বিচিত্র ছন্দে মাদল বাজিয়ে চলেছে, তালে তালে হাত ধরাধরি করে নাচছে ছেলেমেয়েরা। ঘুরে ঘুরে। দুলে দুলে। ছেলেরা পাগড়ি বেঁধেছে মাথায়, মেয়েদের খোঁপায় টকটকে লাল পলাশ ফুল।

বাজনার ছন্দে মন উদাস হয়ে যাচ্ছিল অরুণাশ্বর। কত দিন সে বাঁশি বাজায়নি! বড় ইচ্ছে হচ্ছে সকলের সঙ্গে নাচে গানে মেতে ওঠার। একবার উঠে দাঁড়িয়েও বসে পড়ল। মনে পড়ে গেল কপালের উল্কিটার কথা। যতই যা হোক, সে এখন জীবদত্তর আজ্ঞাবহ দাস বই তো আর কিছু নয়!

রাত্রে অরুণাশ্ব ভারী অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল। মেঘনা নদীর পাড়ে শুয়ে আছেন তার মা, পাশে বসে বাঁশি বাজাচ্ছে অরুণাশ্ব। কী মধুর এক বাতাস বইছে তিরতির! নদী থেকে শব্দ উঠছে ছপছপ! আকাশে অনেক তারা! চাঁদও উঠেছে একটা, চাঁদের কিরণে দিনের মতো ঝলমল করছে চারদিক! এক সময়ে বাঁশি থামাল অরুনাশ্ব। মৃদুস্বরে ডাকল মাকে। সাড়া নেই। জোরে জোরে ডাকল। মা নড়ছেন না। আরও জোরে ডাকল। ঠেলল কয়েকবার। মা তবু

pathagar.net

নিথর। হঠাৎ চতুর্দিক ভয়ানক কালো হয়ে গেল। কিছু দেখা যায় না। নদীকেও না। মাকেও না। কোথায় গেলেন মা ? এই তো শুয়েছিলেন অরুণাশ্বর পাশটিতেই ... ?

ছটফট করতে করতে অরুণাশ্বর ঘুম ভেঙে গেল। মুহূর্তের জন্য বুঝতে পারল না সে কোথায়! পর মুহূর্তে বিরোচনের নাসিকা গর্জন তাকে বাস্তবে ফিরিয়ে দিল।

চোখ রগড়াতে রগড়াতে ঘরের বাইরে এল অরুণাশ্ব। তাদের থাকার জায়গাটি আজ টিলার ওপর। রাজার বাড়ির পাশে। আঁধারে কোন কিছুই প্রায় দেখা যায় না। খানিক দূরের কুঁড়েঘরগুলোও না।

অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল অরুণাশ্ব। বিদ্‌ঘুটে স্বপ্নের মানে খুঁজছে। মা সাড়া দিলেন না কেন ? মার কি কোনও বিপদ হল! অসুখ বিসুখ ? কিংবা তার থেকেও খারাপ কিছু ? নাকি মা'ও অরুণাশ্বকে ভুল বুঝে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন ?

"কে! কে ওখানে ?"

অরুণাশ্ব চমকে তাকাল। ভিক্ষু সুভদ্রর কণ্ঠস্বর না ?

সাড়া দিল অরুণাশ্ব, "আমি।"

সুভদ্র পাশে এসে অরুণাশ্বর পিঠে হাতে রাখলেন, "জেগে আছ যে ? ঘুম আসেনি বুঝি ?"

অরুণাভ উত্তর দিল না। ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলে উলটো প্রশ্ন করল, "আপনি জেগে কেন প্রভু ?"

"আমি তো এ-সময়েই উঠি রোজ। রাত্রির তৃতীয় যামে। এখন আমার ধ্যানে বসার সময়।"

"ও।"

অন্ধকারেও ভিক্ষু সুভদ্রর চোখ দুটি ভারী দীপ্তিময়। স্নিগ্ধ-দৃষ্টি অরুণাশ্বর মুখে। আলগা হাত বোলালেন অরুণাশ্বর কপালে।

boiRboi.net

বুঝি অনুভব করতে চাইলেন কপালের কলঙ্কটাকে। কোমল স্বরে বললেন, "কবিরাজ জীবদত্তর কাছে তোমার জীবন-কাহিনী আমি শুনেছি অরুণাশ্ব। বুঝতে পারছি, তোমার মন খুবই বিক্ষুব্ধ হয়ে আছে। তথাগতকে স্মরণ করো, হৃদয়ে শান্তি পাবে।"

অরুণাশ্ব ফুঁপিয়ে উঠল। প্রায় আর্তনাদের স্বরে বলল "আমি বিনা দোষে শাস্তি পেলাম কেন, তা কি আপনার তথাগত বলতে পারবেন ?"

ভিক্ষু সুভদ্র এক পল চুপ। তারপর বললেন, "তুমি নির্দোষ হলে শাস্তি পাবে না অরুণাশ্ব। ভেবে দ্যাখো, তোমার তো এতদিন বেঁচে থাকার কথাই নয়। তবু তুমি বেঁচে আছ। এও তথাগতর করুণা। তিনি বলেছেন, মানুষ যা করে, ইহজগতেই তার ফল পায়। তুমি যদি কোনও অপরাধ না করে থাকো, তোমার ভবিষ্যৎ কখনও দুঃখময় হতে পারে না।"

"এই যে আমি, বাড়িঘর ফেলে, আমার মাকে ছেড়ে, প্রায় অপরিচিত লোকের দাস হয়ে ভিন্ দেশে চলেছি, একেও কি আপনি শাস্তি বলবেন না প্রভু ?"

"না অরুণাশ্ব, এ হল জীবনের পরীক্ষা। তুমি খুব সৌভাগ্যবান, এত অল্প বয়সেই তুমি জীবনের কঠিন পরীক্ষায় নামার সুযোগ পেয়েছ। মন শক্ত করো। কখনও অসাধু আচরণ কোরো না। জেনেশুনে কারও মনে আঘাত দিয়ো না। দেখবে, কোনও অমঙ্গল তোমায় স্পর্শ করতে পারবে না।

অরুণাশ্বরা শিবের ভক্ত, তথাগত বুদ্ধের ওপর তেমন ভক্তি নেই। তবু ভিক্ষুর বাক্যগুলো তার মর্মে বিঁধে গেল।

নত হয়ে সুভদ্রকে প্রণাম করল অরুণাশ্ব।

কাকভোরে বেরিয়ে পড়ল সকলে।

boiboi.net

ভিক্ষু সুভদ্র পুব দিকে দিলেন। অরুণাশ্বরা পশ্চিমে। এখনও অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে অরুণাশ্বদের। এখান থেকে প্রায় বারো ক্রোশ গেলে ভাগীরথী নদী, তার ওপারে কর্ণসুবর্ণ নগরী। সেখানে বিরোচন রয়ে যাবেন। অরুণাশ্ব আর বৃকোদরকে নিয়ে জীবদত্ত এগোবেন আরও পশ্চিমে। তাঁর গ্রাম মালঞ্চর দিকে।

চলেছে চারজন। রাস্তা বলতে প্রায় কিছুই নেই, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পায়ে চলা পথ। সূর্য দেখে দেখে দিক ঠিক করতে হচ্ছে। রাজা ঝম্পন অরুণাশ্বদের সঙ্গে হিড়িমকে পাঠাতে চেয়েছিলেন, কিছু দূর এগিয়ে দিয়ে আসবে। বিরোচন কিছুতেই সম্মত হলেন না। হিড়িম সম্পর্কে তাঁর মনে একটা চোরা ভয় ঢুকে গেছে। লোকটা যদি আবার তাঁদের পথ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

তবে রাজা ঝম্পনের দেওয়া একটি নতুন পোশাক সানন্দে গ্রহণ করেছেন বিরোচন। যোদ্ধার পোশাক নয় বটে, তবে বেশ জমকালো। শুধু একটা কারণেই বিরোচনের মন খুঁতখুঁত। রাজা যদি একটা পাগড়িও দিতেন!

রাজা ঝম্পন প্রচুর খাবার দিয়ে দিয়েছেন সঙ্গে। বিশাল ধামাভর্তি চিঁড়ে এক হাঁড়ি গুড়, রাশি রাশি ফলমূল। সব একসঙ্গে পোঁটলা করে লাঠির ডগায় ঝুলিয়ে নিয়েছে অরুণাশ্ব। দশ-বিশ পা হেঁটেই পোটলা থেকে খাবলা করে চিঁড়ে তুলে নিচ্ছে বৃকোদর, চিবোতে চিবোতে চলেছে।

জীবদত্ত বয়স্ক মানুষ, তায় পুরো সুস্থ নন। অন্যদের সঙ্গে তাল রাখতে পারছেন না তিনি। ঘন ঘন ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন। অগত্যা বাকিরাও থেমে পড়ছে। বিরোচনও ভক্কারও ছাড়ছেন না। একটা ঝড় তাঁকেও যেন অনেক শান্ত করে দিয়েছে।

বিকেল নাগাদ একটি লোকালয় পড়ল। ছোট্ট গ্রাম, পঞ্চাশ ষাট ঘর মানুষের বাস। গ্রামের শেষ প্রান্তে খেয়াঘাট।

boiRboi.net

ভাগীরথীর। নদী এখানে অনেকটা চওড়া। এপার থেকে ওপারের কর্ণসুবর্ণর বাড়িঘর আবছা আবছা দেখা যায়।

ঘাটে একটিই মাত্র নৌকো। বুড়ো মাঝি বসে আছে পাটাতনে। অরুণাশ্বরা উঠতেই নৌকো ছেড়ে দিল।

খানিক গিয়ে মাঝি প্রশ্ন করল, "কোন ঘাটে যাবেন গো আপনারা!"

বৃকোদর জীবদত্তর পা টিপছিল। পুট করে বলে উঠল, "হাতিঘাট।"

বিরোচন উৎফুল্ল মুখে কর্ণসুবর্ণর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ঘাড় ঘুরিয়ে বৃকোদরকে প্রশ্ন করলেন, "কর্ণসুবর্ণতে হাতিঘাট আছে তুমি জানলে কী করে?"

"কেন সেনাপতিমশাই, জানাটা কি অপরাধ?"

বিরোচনের চোখে সন্দেহ ঘনাল, "তুমি না বলেছিলে, বিক্রমপুর ছেড়ে এই প্রথম বেরোচ্ছ?"

"ও, এই কথা?" বৃকোদর মুচকি হাসল, "সব বড় শহরেই একটা করে হাতিঘাট থাকে। আমি জানি। নইলে রাজার হাতি স্নান করবে কী করে?"

কথায় না পেরে বিরোচন যেন একটু রেগে গেলেন। অনেকক্ষণ পর নিজস্ব ভঙ্গিতে বলে উঠলেন, "তুমি মহা ধড়িবাজ আছ।"

"আজ্ঞে, এ-কথা আমার বাম্‌নি মানে না। বলে, আমি নাকি মহা নির্বোধ।"

"তোমার বাম্‌নিই মহা নির্বোধ। তুমি হলে মহা কুচুটে।" বলতে বলতে হঠাৎ কী যেন মনে পড়ে গেল বিরোচনের, "তুমি আমার ছেতরানো ঘিলু দেখতে চেয়েছিলে, না? এবার কর্ণসুবর্ণ পৌঁছে আমি যদি তোমার ঘিলু ছেতরে দিই?"

boiRboi.net

বৃকোদর ঘাবড়ালও না দমলও না। বলল, "আজ্ঞে, সে তো ছিল কথার কথা। আমরা তো দুটো দিন আপনার সঙ্গে থাকতে চেয়েছিলাম। যদি ফাঁক পেয়ে আপনাকে নিয়ে পালানো যায় ..."

বিরোচন পুরোপুরি সন্তুষ্ট হলেন না। তবে চুপ করে গেলেন। অরুণাশ্বর মজা লাগছিল। আবার বিরোচনের কথাটাকেও মন থেকে সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলতে পারছিল না সে। বৃকোদর নিজেকে যতটা সাধাসিধে সরল বলে, সে কি সত্যিই সে রকম? উহু, মানুষটা যথেষ্ট ধূর্ত। বিক্রমপুরের ঘাট থেকে নৌকোয় উঠেই জীবদত্তর পায়ে পায়ে লেগে আছে। নিজের ভবিষ্যৎ গুছনোর জন্য। সাঁতারেও পটু। বিপদেও সহজে ঘাবড়ায় না। মানুষটা নিজেকে ইচ্ছে করে ভাঁড় সাজিয়ে রাখে না তো?

ঘাট এসে গেল। সন্ধের মুখে মুখে। সত্যিই ঘাটটির হাতি ঘাট নাম সার্থক। অন্তত শ'খানেক হাতি এ-ঘাটে অনায়াসে স্নান করতে পারে। ঘাটের থেকে খানিক দূরে বড় বড় নৌকো বাঁধা। দেখে মনে হয় সমুদ্রে যাবে।

ঘাটের ধারে বড়সড় হাট বসে গেছে। কী না পাওয়া যাচ্ছে! মাছ থেকে আরম্ভ করে ফল শাকসবজি, মুড়ি, পাঁপড়, ফুল, মালা সব। কোথাও সাপুড়ে সাপখেলা দেখাচ্ছে, কোথাও জাদু দেখাচ্ছে জাদুকর, কোথাও বা চলেছে পাঁচালি গান। নগরবাসীরা হাওয়া খেতে এসেছে ঘাটে। ভিড়ে ভিড়ে ঘাট এখন গমগম।

কর্ণসুবর্ণ প্রকাণ্ড শহর। পথঘাট এখানে সোজা সোজা, গলিঘুঁজি বিশেষ নেই। রাস্তার দু পাশে নানা রঙের বাড়ি। কোনওটা দোতলা, কোনওটা তিনতলা। প্রায় প্রতিটি বাড়ির চুড়োয় ধাতুর কপসি বসানো। বিক্রমপুরের মতোই। দেবদেবীর মন্দির রয়েছে অনেক। রয়েছে অনেক বৌদ্ধ মঠও। মন্দিরের তুলনায় মঠগুলোর চেহারা বেশ শ্রীহীন।

boiRboi.net

নগরের সবচেয়ে চওড়া রাস্তাটা গেছে ভাগীরথীর ধার ঘেঁষে। পুব দিকে তার শুধু ঘাট আর ঘাট। পশ্চিম ধারে পর পর রাজকর্মচারীদের বাড়ি। বিশাল বিশাল। প্রাসাদশ্রেণী পার হয়ে পথ যেখানে গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে, সেইখানটিতে রাজার দুর্গ। প্রায় চারশো বছর আগে রাজা শশাঙ্ক গৌড়ের অধীশ্বর হয়ে এই জলদুর্গটি তৈরি করেছিলেন। কালের নিয়মে দুর্গ প্রাচীন হয়েছে বটে, এখনও পুরো জলুস হারায়নি।

এই দুর্গেই এখন বাস করেন মহাসামন্ত দেবকীর্তি। তিনি বল্লাল সেনের অনুগত, কিন্তু কর্ণসুবর্ণে তাঁর দাপট প্রবল। তাঁর নিজস্ব সৈন্যবাহিনীর সংখ্যাও কম নয়।

দুর্গের বাইরে বৃকোদর আর অরুণাশ্বকে দাঁড় করিয়ে রেখে জীবদত্তকে নিয়ে মহাসামন্তর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন বিরোচন। অল্পক্ষণ পরেই ফিরে এলেন। কজঙ্গলের মহাসামন্ত বিক্রমসিংহার্জুনদেব এসেছেন দুর্গে, তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনায় ব্যস্ত আছেন দেবকীর্তি, কালকের আগে কথা হবে না। একটা সুসংবাদও আছে। চাঁদ আর অন্য মাঝিমাল্লা সহ বিরোচনের সৈনিকরা পৌঁছে গেছে কর্ণসুবর্ণে। সৌভাগ্যের বিষয়, বিরোচনের মাত্র দু'জন সৈনিক নিখোঁজ।

অরুণাশ্ব দারুণ খুশি। চাঁদমাঝিকে তার ভীষণ ভাল লেগেছিল। যেমন বীরের মতো চেহারা, তেমন দাপুটে কথাবার্তা, তেমনই সুন্দর তার ব্যবহার। যেচে এসে তার সঙ্গে আলাপ করেছিল চাঁদমাঝি। কত যত্ন করে তাকে খাইয়েছিল। মানুষটা নাকি তার বাবাকেও চিনত!

উৎসাহের সঙ্গে অরুণাশ্ব জিজ্ঞাসা করল, "চাঁদমাঝির সঙ্গে একবার দেখা করা যায় না?"

বিরোচন বললেন, "সে কী করে হবে! চাঁদমাঝি আর তার

boiRboi.net

মাল্লারা উঠেছে সেই গোবিন্দঘাটে। ওখানে মাঝিদের থাকার জন্য ঘর আছে।"

"একবার কি যাওয়া যায় না?"

"সে বিস্তর দূর। হাতিঘাটেরও ওপারে।"

অরুণাশ্ব মিনতি মাখা চোখে জীবদত্তর দিকে তাকাল। তিনি যদি অনুমতি দেন, ঘুরে আসা যায়।

জীবদত্ত ও পথ মাড়ালেনই না। চাঁছাছোলা গলায় বললেন, "দ্যাখো বাপু, সারাদিন অনেক ধকল গেছে। তোমার সঙ্গে কেউ এখন ট্যাঙস-ট্যাঙস করতে পারবে না। মহাসামন্ত আমাদের জন্য তাঁর অতিথিশালা খুলে দিতে বলেছেন। আমরা এখন সেখানে গিয়ে আহার বিশ্রাম করব। মনে রেখো, কাল সকালেই আবার যাত্রা করতে হবে।"

জীবদত্তর স্বর বুঝি স্মরণ করিয়ে দিল অরুনাশ্ব এখনও পরাধীন। নেহাত শিকল বেড়ি খুলে দেওয়া হয়েছে, এই যা।

বিষণ্ণ অরুণাশ্বর রাতে ভাল ঘুম হল না। দু দণ্ড চোখ বোজে, তো গোটা প্রহর জেগে থাকে। রাত যত নিশুত হয়, তত ভারী হয়ে ওঠে বুক। ফিরে ফিরে আসে গত রাতের স্বপ্নটা। মনে পড়ে ভিক্ষু সুভদ্রর কথা। তাঁর নির্দেশ মতো চললেই মনে শান্তি আসবে কি?

শেষ রাতে তন্দ্রামতো এসেছিল। হঠাৎ একটা পাখির আর্তনাদে চটকা ভাঙে। চোখ মেলতেই অরুণাশ্ব দেখল আলো ফুটে গেছে।

পাশে বৃকোদর ঘুমোচ্ছে। পায়ে পায়ে তাকে টপকে অরুণাশ্ব জানলায় গেল। ইশ্, জানলাতেই পড়ে আছে পাখিটা! সাদা পায়রা। ছটফট করছে।

ধবধবে পাখিটার ডানা ভিজে গেছে রক্তে।

boiRboi.net

বেড়াল থাবা মেরেছে কি ? কুকুর কামড়ে ধরেছিল কি ?

অরুণাশ্ব হাতে তুলে নিল পায়রাটাকে। কাপড়ের খুঁট দিয়ে মুছছে ডানার রক্ত। সযত্নে। অতি সাবধানে।

আহা রে, বাঁচবে তো পাখিটা !

সন্ধেবেলা মহারানি রামদেবীর সঙ্গে কড়ি খেলতে বসেছিলেন রাজা বল্লালসেন। এমনিতে রোজ এই সময়টা তাঁর কাটে গানবাজনা শুনে, নয় নাচ দেখে। অথবা প্রিয় সভাসদদের নিয়ে আড্ডা জমান রাজা। দু-তিনজন মাইনে করা বিদূষক আছে তাঁর, তাদের কাজ রঙ্গরসিকতা করে ওই সময়ে রাজাকে হাসিখুশি রাখা। আজ ওসব একঘেয়ে লাগছিল রাজার, তাই এই অন্তঃপুরে আগমন।

বৈশাখ মাস। সারাদিন সূর্য জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মারে। সদাশিবের পুজোয় বসার আগে আরাম করে আজ সুগন্ধি জলে স্নান করেছিলেন রাজা। তাঁর গা দিয়ে এখনও ভুরভুর কেতকীর সুবাস বেরোচ্ছে। প্রৌঢ়া রানিও আজ সেজেছেন খুব। খোঁপায় জুঁই ফুলের মালা, কপালে কুমকুম, গা-ভর্তি গয়না। দরজায় তাম্বূল পাত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে রামদেবীর খাস দাসী শ্যামা। ছোট-ছোট পানের খিলি সাজা আছে পাত্রে। রানি ইশারা করলেই পান নিয়ে ছুটে আসছে। শ্যামার হাতে সাজা মিঠে পান বল্লালসেনের ভারী প্রিয়।

খেলা জমে উঠেছে। মখমলের বিছানায় গড়িয়ে যাচ্ছে কড়ি, ঝুঁকে পড়ে দেখছেন রাজা-রানি। প্রতিবারই খুশিতে তালি দিয়ে

উঠছেন রামদেবী, বল্লালসেনের মুখ বেজার। রানির কাছে বারবার হারছেন রাজা।

রামদেবীর ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি, "আজ আপনার দিন খারাপ মহারাজ। আপনি আজ পারবেন না।"

বল্লালসেন সন্দিগ্ধ চোখে রামদেবীর দিকে তাকালেন, "তুমি চুরি- টুরি করছ না তো?"

"ওমা, সে কী কথা!"

"সবই সম্ভব। হয়তো তোমার কড়ির মধ্যে শেখানো কোনও কীট পোরা আছে। শকুনির পাশার মতো।"

রামদেবীর মুখ সামান্য ভার হয়ে গেল, "আপনার কি তাই মনে হয়?"

"হচ্ছে তো।.... কিংবা তুমি এমন কোনও তঞ্চকতা করছ যা আমি ধরতে পারছি না।"

রামদেবী দুম করে কড়িগুলো হাত থেকে ফেলে দিলেন।

বল্লালসেন হেসে ফেললেন, "কী হল?"

"আপনার সঙ্গে খেলব না।" রামদেবীর মুখ ক্রমশ আষাঢ়ের মেঘের মতো কালো, "আপনি আমায় শাস্তি দিন।"

"সে কী! কেন?"

"ওই যে বললেন আমি তঞ্চকতা করেছি।"

"ওটা তো কথার কথা। ঠাট্টা করছিলাম।"

"উঁহুঁ, ঠাট্টা নয়। এ আপনার মনের কথা। আপনি খেলাতেও হার মানতে শেখেননি।" রামদেবী রাজবংশের মেয়ে, তাঁর যেন মানে লেগে গেছে খুব। আবার বললেন, "দিন শাস্তি। আপনার রাজ্যে তো অনুমানের ওপর নির্ভর করে সাজা দেওয়ার প্রথা চালু হয়ে গেছে। অমন একটা নিরীহ ছেলেকে বিনা দোষে প্রাণদণ্ড দিয়ে দিলেন....।"

boiRboi.net

বল্লালসেন অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন, "তুমি এখনও সেই অরুণাশ্বর শোক ভুলতে পারোনি?"

"আহা, ভোলা কি যায়! রামদেবী নাক টানলেন, "অমন সুন্দর নিষ্পাপ মুখ....!"

"অকারণে মন খারাপ করছ কেন রানি? ওর প্রাণদণ্ড তো আমি রদ করে দিয়েছি।"

"ছাই করেছেন। কপালে দেগে দিয়ে কার না কার হাতে তুলে দিলেন.... সে ওকে কাটবে, ছিঁড়বে...." বলতে বলতে রামদেবী চোখ মুছলেন, "আমিও কিন্তু বলে রাখছি মহারাজ, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। একদিন না একদিন জগৎসংসারের সামনে সত্য প্রকাশিত হবেই।"

"সে সম্ভাবনা আর নেই মহারানি।"

"যদি প্রকাশ হয়?" রামদেবী সহসা চোখ তুলে রাজার দিকে তাকালেন, "তখন আপনি সত্যিটা মানবেন তো? পারবেন হার মানতে?"

"তা হলে সবচেয়ে খুশি বোধ হয় আমিই হব। ছেলেটিকে আমারও ভাল লেগেছিল। অমন একটি স্বাস্থ্যবান তেজি ছেলেকে আমার সৈন্যদলে পেলে বেশ হত।"

"কথাটা স্মরণে থাকবে তো মহারাজ?"

"থাকবে। থাকবে। নাও, কড়িগুলো তোলো। চাল দাও।"

রামদেবীর ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠল। হাসিটা যেন কেমনতরো! রহস্যময়! রাজা বল্লালসেন হাসিটাকে ঠিকঠাক পড়তে পারলেন না।

খেলা আবার শুরু হল।

রাজপ্রাসাদে দাসীদের নানা শ্রেণী আছে। শ্যামা মহারানির প্রধানা দাসী, কিন্তু তাকেও প্রায় ছোটখাটো রানিই বলা যায়। তারও

boiRboi.net

নিজস্ব কিছু দাসী আছে অন্তঃপুরে। তাদের একজন হঠাৎ দরজায় এল। ফিসফিস করে কী যেন বলল শ্যামাকে।

শ্যামা ত্বরিত পায়ে রানির ঘরে ঢুকেছে। মাথা নামিয়ে বলল, "মহারাজ, মন্ত্রী সংগ্রামদত্ত আপনার জন্য প্রতীক্ষা করছেন। জরুরি দরকার।"

বল্লালসেন বিরক্ত হলেন। সন্ধের পর রাজকার্যে তাঁর দারুণ অনীহা। তবে উঠেও পড়লেন। জরুরি প্রয়োজনের সময়ে রাজাকে বিশ্রাম ভুলে যেতে হয়।

মন্ত্রণাকক্ষেই অপেক্ষা করছেন সংগ্রামদত্ত। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, অতি বিচক্ষণ এবং পণ্ডিত মানুষ। মহারাজা বিজয়সেনের আমলেই মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি রাজা বল্লালসেনের মহাসান্ধিবিগ্রহিক। অর্থাৎ কিনা বিদেশ দফতরের দেখাশুনো করেন। মহামন্ত্রী ত্রিবিক্রম শর্মা ক'দিন আগে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, সংগ্রামদত্তই এখন তাঁর গুরুদায়িত্ব সামলাচ্ছেন।

বল্লালসেন ঢুকেই বললেন, "কী খবর? হঠাৎ এই সময়ে?"

সংগ্রামদত্ত শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন, "ক্ষমা করুন মহারাজ, না ডেকে পারলাম না। একটা বিশেষ সংবাদ আছে।"

বল্লালসেনের কপালে ভাঁজ পড়ল।

"একটু আগে কর্ণসুবর্ণ থেকে আমার এক চর এসে পৌঁছেছে। সে বার্তা দিল, কর্ণসুবর্ণর মহাসামন্ত, কজঙ্গলের মহাসামন্ত আর অপর-মন্দারের সামন্ত, তিনজনে সম্প্রতি একসঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। ওঁদের উদ্দেশ্য ভাল নয়।"

"কীরকম?"

"সম্ভবত একসঙ্গে গৌড় আক্রমণ করার অভিসন্ধি করেছেন।"

বল্লালসেন গর্জে উঠলেন, "আমার অধীনে থেকে এতদূর

boiRboi.net

স্পর্ধা?"

"স্পর্ধাও বলতে পারেন, লোভও বলতে পারেন। দুর্বল গৌড়কে আক্রমণ করে কে না এখন গৌড়েশ্বর হতে চায়!"

বল্লালসেন কয়েক পল নীরব। তারপর বললেন, "আপনি কী করতে বলেন?"

"আমি এইমাত্র মহামন্ত্রী ত্রিবিক্রম শর্মার সঙ্গে আলোচনা করে এসেছি। তাঁর মতে বিদ্রোহের আগুন জ্বলার আগেই নিভিয়ে ফেলা উচিত।"

"বটেই তো।"

"যুবরাজ লক্ষ্মণসেন তো ফিরে এসেছেন। যদি তাঁর নেতৃত্বে একটি বড়সড় সৈন্যদল কর্ণসুবর্ণর দিকে পাঠিয়ে দেওয়া যায়, তা

হলে হয়তো আমাদের যুদ্ধে নামতেই হবে না। কর্ণসুবর্ণর মহাসামন্ত দেবকীর্তির উচ্চাশা আছে বটে, তবে তিনি ভিতু। কজঙ্গলের মহাসামন্ত বিক্রমসিংহার্জুনদেবও তাই। অপরমন্দারের কপিলদেব সিংহাসন চান না। তাঁর চোখ গৌড়ের ধনরত্নে। দেবকীর্তি আর বিক্রমসিংহার্জুনকে সঙ্গী না পেলে তিনি তাঁর লোভ সংবরণ করে নেবেন। তবু যুবরাজ গেলে আমাদের লাভ হবে এই

যে, মিথিলা আক্রমণের পথে আমরা অনেকটা এগিয়ে থাকব। আমরা ঘাঁটি গাড়ব কর্ণসুবর্ণয়। দেওপাড়ায় নয়।"

"উত্তম প্রস্তাব। আমাদের কজঙ্গলের হাতি সংগ্রহের কী অবস্থা?"

"সে নিয়ে কিছু গোলযোগ হয়েছে মহারাজ। হাতি সংগ্রহের জন্য যে গণস্থকে পাঠিয়েছিলাম, পথে নৌকোডুবি হয়ে সে বেশ বিপদে পড়েছিল। তারপর যা হোক করে কর্ণসুবর্ণয় পৌঁছেছে। বিক্রমসিংহার্জুন তখন কর্ণসুবর্ণে ছিলেন। তিনি সেই গণস্থকে সাহায্য করতে গড়িমসি করছিলেন।"

বল্লালসেন মৃদু হাসলেন, "তা হলে লক্ষ্মণকে এখনই রওনা হয়ে যেতে বলি? সে যাচ্ছে শুনলে কজঙ্গলের ওই পিশুনটা সুড়সুড় করে কাজে নেমে পড়বে।"

"ঠিকই বলেছেন মহারাজ। আপনি শুনলে খুশি হবেন, ওই তিন জায়গার সামন্তদের খবরাখবর রাখতে এক দক্ষ রাজপুরুষকে পাঠানো হয়েছে। সে কর্ণসুবর্ণ থেকে কিছুটা দূরে থাকবে। তবে তিন জায়গার চরেদের সঙ্গেই যোগাযোগ রাখবে। লোকটি খুবই ধুরন্ধর। দরকার হলে বিক্রমসিংহার্জুন দেবকীর্তি আর কপিলদেবের মধ্যে সে বিবাদও বাধিয়ে দিতে পারে।"

"কে সে? আমি চিনি তাকে?"

"আজ্ঞে না মহারাজ। মহামন্ত্রী ত্রিবিক্রম শর্মা তাঁকে জোগাড় করেছেন। তিনিই পাঠিয়েছেন।" সংগ্রামদত্ত একটু থেমে থেকে বললেন, "তার আরও কিছু কাজ আছে। রানিমার কাজ।"

"রানিমার কাজ?" বল্লালসেন অবাক হলেন।

"হ্যাঁ মহারাজ।"

"কী কাজ?"

সংগ্রামদত্ত মাথা নোয়ালেন, "বলতে পারব না মহারাজ।

boiRboi.net

মহামন্ত্রী জানেন।"

মহারানি রামদেবীর সঙ্গে ত্রিবিক্রম শর্মার একদম পিতা-পুত্রীর সম্পর্ক। মাঝেমধ্যেই ত্রিবিক্রম শর্মাকে সরাসরি বলে দেশবিদেশ থেকে হরেকরকম শৌখিন জিনিস আনান রামদেবী। কখনও-বা দুর্মূল্য বস্ত্র, কখনও কোনও বিচিত্র সুগন্ধী। বল্লালসেন জানেন। এবারও হয়তো তেমন কিছু....!

সংগ্রামদত্ত উঠে দাঁড়ালেন, "আমি তা হলে সেনাপতি ভাস্করকে কালই সকালে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলছি। কোষাগারে অর্থের পরিমাণও সকালে আপনাকে জানিয়ে দেব।"

সংগ্রামদত্ত চলে গেলেন।

একটুক্ষণ মন্ত্রণাকক্ষে বসে রইলেন বল্লালসেন। একা। এক মাস পর কাল সবে আমোদ আহ্লাদ সেরে বিক্রমপুর ফিরেছে লক্ষ্মণ, হয়তো বিশ্রাম নিচ্ছে। এখনই কি ডাকবেন?

খানিক দ্বিধার পর বল্লালসেন হাঁক দিলেন, "অর্কদাস?"

শিরোরক্ষক পলকে উপস্থিত, "আদেশ করুন মহারাজ।"

"যুবরাজকে খবর পাঠাও, সে যেন এখনই আমার সঙ্গে দেখা করে। আমি গ্রন্থাগারে আছি।"

যুবরাজ লক্ষ্মণসেন নিজের মহলে বন্ধুবান্ধব নিয়ে গল্প করছিলেন। তাঁর বয়স চল্লিশ পেরোলেও এখনও তাঁকে অনায়াসে সদ্য যুবক বলে মনে হয়। অতি রূপবান তিনি। যেমন চোখ নাক মুখ, তেমন টকটকে গায়ের রং, তেমনই বলশালী চেহারা। বাঘ শিকার করতে বাগড়ি দেশে গিয়েছিলেন লক্ষ্মণসেন। সেই দক্ষিণবঙ্গে, সমুদ্রের কাছে, ঘন জঙ্গলে। সেই শিকারের রোমহর্ষক কাহিনীই শোনাচ্ছিলেন তিনি। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে আছেন পণ্ডিত হলায়ুধ মিশ্র, যুবরানি বল্লভার ভাই কুমারদত্ত, এবং আরও কয়েকজন। হংসো মধ্যে বকো যথা হয়ে এক মধ্যবয়স্ক মানুষও

boiRboi.net

আছেন। লক্ষ্মণসেনের প্রতিটি কথায় চাটুকারের মতো মাথা নাড়ছেন তিনি।

এই মানুষটির নাম নয়নাগ। অরুণাশ্বর কাকা। ইনি হলায়ুধ মিশ্রের এক ঘনিষ্ঠ সহচর।

বল্লালসেনের ডাক পৌঁছতেই যুবরাজের আসর ভেঙে গেল। দ্রুত ছুটে এসেছেন গ্রন্থাগারে। একান্তে বসে বল্লালসেনের মুখে শুনলেন সব। ঠাকুর্দা বিজয়সেনের সময় থেকে যুদ্ধে যাচ্ছেন লক্ষ্মণসেন। বাড়ির চেয়েও যুদ্ধক্ষেত্রই এখনও তাঁকে টানে বেশি। বাবার কথায় তিনি কর্ণসুবর্ণ যেতে এক পায়ে খাড়া।

পরদিনই বিক্রমপুরে সাজ সাজ রব পড়ে গেল।

দেখতে দেখতে মালঞ্চ গ্রামে মাসখানেক কেটে গেল অরুণাশ্বর। এখানে অরুণাশ্ব মোটামুটি ভালই আছে। জীবদত্তর দোতলা মাটির বাড়িটিতে তার ঠাঁই হয়নি, সে থাকে পাশেই এক ছোট্ট কুঁড়েঘরে। জীবদত্তরই ঘর, রুগির বাড়ির লোকজনের রাতবিরেতে থাকার জন্য তৈরি করা। সারাদিন জীবদত্তর স্ত্রীর নানান ফাইফরমাশ খাটে অরুণাশ্ব। জল তোলা, কাঠ কাটা, উনুন ধরানো, ঘর উঠোন নিকোনো, গোরুকে খড়-বিচালি দেওয়া, এইসব। অনভ্যস্ত কাজ, তবু অরুণাশ্ব মুখ বুজে সব করে যায়। জীবদত্তর স্ত্রী একটু মুখরা, খেতে দেওয়ার ব্যাপারেও কৃপণ। পরের বাড়িতে অন্য কী আশা করে অরুণাশ্ব?

জীবদত্ত এখনও অরুণাশ্বর ওপর তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু

boiRboi.net

করেননি। তিনি এ-অঞ্চলের প্রখ্যাত কবিরাজ, বহু দূর-দূর স্থান থেকে তাঁর কাছে রুগি আসে। এমনকী কঙ্কগ্রাম, কর্ণসুবর্ণ, চম্পা দেশ থেকেও। মাসাধিক কাল দেশছাড়া থাকার জন্য এখন তাঁর গৃহে নিত্যই রুগির ভিড়। তাদের নিয়েই তিনি মহা ব্যস্ত। সম্ভবত বর্ষা পড়লে তাঁর গবেষণার কাজ শুরু হবে। বর্ষাকালে সাপের বিষ সুলভ হয়।

আজ বিকেলে জীবদত্তর দাওয়ায় বসে প্রকাণ্ড এক কাঠের টুকরো কাটছে অরুণাশ্ব। দা দিয়ে ফালা করছে, হাঁটু চেপে চিরছে। তার ঘামভেজা কাঁধে বসে আছে সেই সাদা পায়রাটি, কর্ণসুবর্ণর অতিথিশালা থেকে কুড়িয়ে আনা। অরুণাশ্বর সেবা শুশ্রূষায় পাখির ডানার ক্ষত অনেকটাই সেরে এসেছে। তবে এখনও পাখি ভালভাবে উড়তে পারে না, ক'বার ডানা ঝটপট করেই মুখ থুবড়ে পড়ে। অরুণাশ্বর ভারী পোষ মেনে গেছে পাখি, একটু সময় অরুণাশ্বকে না দেখলেই সে বক্‌বকম শুরু করে দেয়।

কোত্থেকে ছুটে এল সেঁজুতি, চুপটি করে দাঁড়িয়েছে অরুণাশ্বর পেছনে। সেঁজুতি জীবদত্তর ছোট মেয়ে। বয়স বারো তেরো বছর। তার আগের তিন দিদির বিয়ে হয়ে গেছে, সে'ই এখন এ-বাড়ির আদুরে রাজকন্যা। একটা সব্‌জে কালো ডুরে শাড়ি গাছকোমর করে পরেছে সেঁজুতি। একদৃষ্টে অরুণাশ্বর কর্মকাণ্ড দেখছে। মাত্র এক মাসেই অরুণাশ্বর খুব ভক্ত হয়ে পড়েছে সে। মা অরুণাশ্বকে বকলে তার ঠোঁট ফুলে ওঠে। খেতে দিতে দেরি করলে মা'র সঙ্গে ঝগড়া জোড়ে। অরুণাশ্ব মন খারাপ করে ঘরে বসে থাকলে নিজেই সে এসে গল্প জোড়ে শতেক। চুরি করে অরুণাশ্বকে আমটা জামটা খাওয়ায়। অরুণাশ্বর পাখিটারও সে খুব সেবাযত্ন করে।

বেশিক্ষণ চুপ করে থাকা সেঁজুতির ধাতে নেই। পুট করে সে প্রশ্ন করে বসল, "তুমি এত মন দিয়ে কী বানাচ্ছ গো রোমথাদাদা?"

boiRboi.net

অরুণাশ্বর হাত থেমে গেল। তার রোমথা নামটাই চালু হয়ে গেছে চারদিকে। এ-গ্রামে প্রথম যেদিন সে পা রেখেছিল, এধার ওধার থেকে মানুষ ভিড় জমিয়েছিল তাকে দেখতে। জীবদত্তকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন। ও কবরেজমশাই, একে আপনি পেলেন কোত্থেকে? আহা, অমন ফুটফুটে ছেলের কপালে ওটা কী দেগে দেওয়া হয়েছে গো কবরেজমশাই? ওমা, ওটা একটা লেখা! কী লেখা? রোমথা? রোমথা মানে কী গো? গ্রামের কচিকাঁচারা অরুণাশ্বকে ঘিরে রোমথা রোমথা বলে চিৎকার শুরু করল। মেয়ে বুড়ো জোয়ানের দল বিড়বিড় করে উচ্চারণ করছে রোমথা শব্দটা। ব্যস, অরুণাশ্ব নামটাই মুছে গেল। শুধু জীবদত্ত আর বৃকোদর ছাড়া অরুণাশ্ব নামে কেউ ডাকে না আজকাল। এ বাড়ির মেয়ে সেঁজুতিও নয়। প্রথম-প্রথম রোমথা ডাকে অস্বস্তি বোধ করত অরুণাশ্ব, ইদানীং সয়ে এসেছে। সেঁজুতির মুখে ডাকটা শুনতে ভারী মিষ্টিও লাগে।

হাসিমুখেই অরুণাশ্ব ঘাড় ঘোরাল, "আমার পাখির জন্য ঘর তৈরি করছি গো।"

"কেমন ঘর?"

"চৌকো মতো। ছোট্ট একটা ফাঁক থাকবে, তাই দিয়ে ভেতরে ঢুকে যাবে পাখি..."

"ঘরটা রাখবে কোথায়?"

"একটা বাঁশে বেঁধে ওপরে ঝুলিয়ে দেব।"

"বেড়াল যদি ধরে?"

"পারবেই না। দরজা করা থাকবে। রাতে দরজাটা আটকে দেব।"

"দমবন্ধ হয়ে পাখি মরে যাবে না?"

"মাথার দিকে অনেক গোল-গোল ফুটো রাখছি। পাখির একটুও

boiRboi.net

কষ্ট হবে না। ভেতরে দানা দিয়ে দেব, মাটির সরায় জল দিয়ে দেব। রাতে খিদে-তেষ্টা পেলে পাখির কিছু অসুবিধে হবে না।"

অরুণাশ্ব আবার কাজে হাত লাগাল। সরু-সরু অনেক কাঠের ফালি বেরিয়েছে, চেঁছে-চেঁছে গাগুলোকে মসৃণ করছে।

সেঁজুতি নতুন প্রশ্ন জুড়ল, "তুমি আগে যেখানে ছিলে সেখানেও কি পাখি পুষতে রোমথাদাদা?"

অরুণাশ্বর বুকটা ভারী হয়ে গেল হঠাৎ। পুরনো কথা, পুরনো জীবন সে সম্পূর্ণ ভুলে যেতে চায়। কেন মনে করিয়ে দিচ্ছে সেঁজুতি? সুবর্ণগ্রামে তার একবার খুব পাখি পোষার শখ হয়েছিল। তাদের বাগানে টিয়াপাখির ঝাঁক নেমেছিল, জাল পেতে ধরেছিল কয়েকটা। মা একটাও পাখি রাখতে দেননি, সব উড়িয়ে দিয়েছিলেন। বাবা গম্ভীর মুখে বলেছিলেন, খোলা আকাশের পাখিকে কখনও বন্দি করতে নেই। ওরা দুঃখ পেলে সেটা তোমার জীবনে দুঃখ হয়ে নেমে আসবে।

অরুণাশ্ব তর্ক জুড়েছিল, "আমি তো ওদের খাওয়াদাওয়া দেব বাবা। বড়সড় একটা খাঁচা বানিয়ে দেব, তার মধ্যেই ওরা প্রাণ খুলে উড়ে বেড়াতে পারবে।"

"তোমায় খাবার দিয়ে খাঁচায় আটকে রাখলে তুমি খুশি হবে তো অরুণাশ্ব?"

বাবার সেই কথা এখন মর্মে-মর্মে টের পায় অরুণাশ্ব। এই মালঞ্চ গ্রামেও সে বন্দি ছাড়া আর কী?

অরুণাশ্ব দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "পাখি আমি পুষতাম না। একেও রাখব না কাছে। সুস্থ হলেই উড়িয়ে দেব। যদি এই ঘরে ফিরে আসতে চায় তো আসবে। নয়তো...."

"পাখিটা উড়ে চলে গেলে তোমার মন কেমন করবে না?"

বিষণ্ণ অরুণাশ্ব সুস্থির মতো উত্তর দিতে পারল না। বৃকোদরের

boiRboi.net

আবির্ভাব হয়েছে।

এসেই অরুণাশ্বকে নিয়ে টানাটানি শুরু করল বৃকোদর, "চলো চলো, উঠে পড়ো।"

অরুণাশ্ব অবাক হয়ে বলল, "কোথায় যাব?"

"হাঁটবে আমার সঙ্গে। বিকেলবেলা কি কেউ বসে থাকে?"

"হাতে কাজ রয়েছে যে। পাখির ঘরটা আজকেই বানিয়ে ফেলব ভাবছিলাম।"

"পাখি তো তোমার সঙ্গেই সেঁটে আছে। তার ঘর কাল বানালেও হবে। কিন্তু এমন সুন্দর বিকেল তো কাল নাও আসতে পারে। কী চমৎকার নীল আকাশ, ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে..."

"চলুন তবে।" অরুণাশ্ব হাতের দা রেখে উঠে দাঁড়াল। ঝুড়ি দিয়ে চাপা দিয়ে দিল পায়রাটাকে।

সেঁজুতি বলে উঠল, "তোমরা কোন দিকে যাচ্ছ গো কচিঠাকুর দাদা?"

হ্যাঁ, বৃকোদরেরও এই নাম চালু হয়েছে মালঞ্চে। পুরনো বামুন রাম শর্মাকে বুড়োঠাকুর বলে ডাকে সবাই। বৃকোদরের বয়স কম বলে সে কচিঠাকুর।

বৃকোদর চোখ ঘুরিয়ে বলল, "তার তো ঠিক নেই দিদি। যেদিকে দু'চোখ যায় সেদিকেই যাব।"

"নদীর দিকে যাবে?"

"যেতে পারি।"

মালঞ্চর দক্ষিণ সীমা ছুঁয়ে নদী মানে নদীর খাত আছে একটা। পুরোপুরি শুকনো। বালি আর পাথর ছাড়া কিছু নেই সেখানে। কজঙ্গল পাহাড় থেকে নেমে আসা স্রোতটা মরে গেছে কবেই। ঘোর বর্ষাতেও ওই খাতকে নালার বেশি কিছু বলা যায় না। বড়জোর হাঁটুজল থাকে তখন। ময়ূরাক্ষী ভাগীরথী দুই নদীই

boiRboi.net

মালঞ্চ থেকে অনেক, অনেক দূরে। তাই গ্রামের লোক ওই খাতকেই ভালবেসে নদী বলে। বিকেলে ওই মরা নদীর সোঁতা ধরে হাঁটতে অবশ্য মন্দ লাগে না।

সেঁজুতি লাফিয়ে উঠল, "আমিও তা হলে তোমাদের সঙ্গে যাব।"

"না, তুমি যাবে না। উঠোনের ওপার থেকে জীবদত্তর স্ত্রীর হুঙ্কার উড়ে এল।"

"একটু যাই না মা।"

"না। ওরা কখন ফিরবে তার ঠিক নেই.... সন্ধের পর মেয়েরা রাস্তায়-রাস্তায় ঘোরে না। তোমাকে এখন তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালতে হবে, আমার সঙ্গে রান্নায় হাত লাগাতে হবে...."

সেঁজুতি মুখ কালো করে ঘরে ফিরে গেল।

দেখে অরুণাশ্বর একটু মন খারাপ হয়ে গেল বটে, তবে বাইরে বেরিয়ে সেঁজুতির কথা তার মাথাতেই রইল না।

লাল মাটির পথ ধরে হাঁটছে দু'জনে। এ-পাশে ও-পাশে ছোট-ছোট পল্লী। এক-এক সম্প্রদায় এক-এক পল্লীতে বাস করে। মালঞ্চ গ্রামটা ছোটই, জোর ষাট-সত্তর ঘর মানুষের বসতি আছে। বেশিরভাগই কুম্ভকার সম্প্রদায়ভুক্ত, আছে কয়েকঘর তন্তুবায়ও। গ্রামের পুবে আর দক্ষিণে সকলেরই অল্পবিস্তর জমি আছে। সেখানেই তারা ধান ফলায়, সবজি চাষ করে কিংবা আখ চাষ। এখন চাষের সময় নয়। সকলেই এখন যে যার পেশায় নিযুক্ত। কোনও পাড়া থেকে ঠাঁই ঠকাঠক নেহাই হাতুড়ির আওয়াজ ভেসে আসছে, কোথাও বা চাকার গায়ে মাটি ঘুরে তৈরি হচ্ছে হাঁড়ি কলসি। কোথাও বা তাঁত চলছে খটখট খটাখট। দু'চারজন মানুষের সঙ্গে দেখা হল মুখোমুখি। স্বাভাবিক কুশল প্রশ্ন করে চলে গেল তারা। মানুষের মনে কোনও উত্তেজনাই বেশিদিন থাকে না। এক

মাসেই গ্রামবাসীরা অরুণাশ্বকে সহজ মনে মেনে নিয়েছে। অরুণাশ্ব, মানে তাদের রোমথা যেন চিরকালই এই গ্রামের লোক।

হাঁটতে-হাঁটতে বৃকোদের জিজ্ঞেস করল, "সত্যি করে বলো তো ভাই, এই লাল মাটির দেশ তোমার ভাল লাগছে?"

অরুণাশ্ব ছোট্ট শ্বাস ফেলল, "আমার ভাল লাগা না লাগায় কী এসে যায় বামুনঠাকুর?"

"আহা বলো না, ভাল লাগছে না। আমি তো আর কবরেজমশাইকে বলতে যাচ্ছি না।"

"মন্দই বা কী?" অরুণাশ্ব উদাসভাবে বলল, "বড্ড বেশি গরম। শুকনো গরম। আমাদের দেশের মতো এদিকে তো নদী খাল বিল নেই।"

"তা বটে। তোমার খুব নদীর কথা মনে পড়ে, না?"

"সর্বক্ষণই পড়ে।"

"ফিরতে ইচ্ছে করে সেই সুবর্ণগ্রামে?"

"কেন কষ্ট দিচ্ছেন বামুনঠাকুর? জানেনই তো, এ-জীবনে কখনও আর সুবর্ণগ্রামে ফেরা হবে না।"

"তা হলে ওই অন্যায় কাজটা করতে গিয়েছিলে কেন?"

মনোরম বিকেলটা অরুণাশ্বর চোখে হাকুচ তেতো হয়ে গেল। রোজই বৃকোদরের সঙ্গে এত মনপ্রাণের কথা হয়, কেন রোজ ঘুরে-ফিরে এই এক কথায় চলে আসে বৃকোদর? অন্য দিন কৌশলে প্রসঙ্গটা পালটে দেয় অরুণাশ্ব, আজ খিঁচিয়ে উঠল, "কতবার বলব আপনাকে আমি কোনও অন্যায় কাজ করিনি! বাবার মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী নই।"

"চটো কেন? আমি ঠাট্টা করছিলাম।" বলতে-বলতে বৃকোদর অরুণাশ্বর পিঠ চাপড়াল, "আচ্ছা অরুণাশ্ব, ওই দিনটার কথা তোমার স্পষ্ট মনে আছে?"

"ওই সকালটাকে কি আমি ভুলতে পারি?"

"কে প্রথম তোমার ডাক শুনে ছুটে এসেছিল?"

"গোষ্ঠ। বলেছি তো আপনাকে।"

"গোষ্ঠ কি একাই ছিল?"

"হ্যাঁ। একাই তো।"

"ভাল করে মনে করো।"

একটুক্ষণ ভাবল অরুণাশ্ব। ছবিটাকে মনে-মনে দেখল আর এক বার। তারপর বলল, "হ্যাঁ, একাই। তবে খুব তাড়াতাড়ি এসেছিল।"

"গোষ্ঠ তোমাদের বাড়ির কর্মচারী তো? কী কাজ করত গোষ্ঠ?"

"আমাদের পাচককে রান্নার কাজে সাহায্য করত।"

"গোষ্ঠ তোমাদের কতদিনের পুরনো লোক?"

"খুব পুরনো নয়। বছর তিনেক হবে বড়জোর। কাকা তাকে নিয়ে এসেছিলেন বিক্রমপুর থেকে।"

"ওই সময়ে গোষ্ঠর কোথায় থাকার কথা?"

"রান্নাঘরে। রোজ সকালে বাবা বেড়িয়ে ফিরে ফলের রস খেতেন। গোষ্ঠ বানাত সেটা।"

"তোমার বাবার মৃতদেহ যেখানে পড়ে ছিল সেখান থেকে তোমাদের রান্নাঘর কদ্দূর?"

"অনেকটা দূর। বাড়ির পেছন দিকে।"

"তা হলে সে সঙ্গে-সঙ্গে এল কী করে?"

প্রশ্নটা অরুণাশ্বর মাথাতেও এসেছে অনেকবার। মুখ ফুটে কাউকে বলতে পারেনি। আজও পারল না, শুধু হাত ওলটাল।

বৃকোদর ফের বলল, "তুমি বলেছিলে না যে খঞ্জরে তোমার বাবা বিদ্ধ হয়েছিলেন সেই খঞ্জরটি তুমি কাকার ছেলেকে দিয়ে দিয়েছিলে? তোমার কাকা বলেছিলেন ওটা হারিয়ে গেছে। কবে

পরিগৃহীত দি. 3.3.09
732
7.5.2009
বই নং
তারিখ
স্ফান
অনুবাদক : হক লিমিটেড

boiRboi.net

বলেছিলেন?"

"বিচারের সময়। ধর্মাধ্যক্ষের সামনে।"

"তোমার বাবার মৃত্যুর ক'দিন আগে কাকা বিক্রমপুরে গিয়েছিলেন?"

"আগের দিন।"

"বিক্রমপুরে তোমার কাকার কে কে বন্ধু ছিল, তুমি জানো?"

"না। একটা নাম অবশ্য শুনেছি মাঝেমধ্যে। হলায়ুধ মিশ্র।"

বৃকোদর যেন চমকে উঠল, "তুমি ঠিক জানো?"

"হ্যাঁ। কেন?"

"তোমার বাবার সঙ্গে কাকার সম্পর্ক কেমন ছিল?"

অরুণাশ্বর দুঃখের মধ্যেও হাসি পেল, "আপনি যা ভাবছেন তা নয়। আমার কাকা তেমন মানুষ নন। কাকা আমোদ-প্রমোদ করতেন ঠিকই। ব্যবসাতেও মন ছিল না। এই নিয়ে বাবা কাকাকে মাঝে মাঝে বকাবকিও করতেন। কাকা কক্ষনো বাবার মুখে-মুখে তর্ক করতেন না। বাবাকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন কাকা।"

"তোমার বাবার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী তো এখন ওই কাকাই? বৃকোদরের ঠোঁটের কোণে এক বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল। অর্থই অনেক সময় অনর্থের মূল হয়।"

জোরে-জোরে দু'দিকে মাথা ঝাঁকাল অরুণাশ্ব। কথাটা মানতে পারছে না। হঠাৎই নজরে পড়ল, সামনেই শিবমন্দির। অর্থাৎ গ্রামের একেবারে উত্তর প্রান্তে এসে পড়েছে তারা। জীবদত্ত তাকে বেরোতে নিষেধ করেন না, কিন্তু তাঁকে না জানিয়ে এতদূর সে কখনও আসে না।"

অরুণাশ্ব বলে উঠল, " নদীর দিকে না গিয়ে আমরা এদিকে চলে এলাম কেন?"

"এসেই যখন পড়েছ, কী করা যাবে! চলো, আমার ঘরে গিয়ে

একটু বসি।"

বৃকোদরের ঘর মানে বাখারির গায়ে দরমার বেড়া দেওয়া খড়ের ছাউনি। শিবমন্দির থেকে খানিক তফাতে। মালঞ্চে এসেই শিবমন্দিরের পুরোহিত হতে পারেনি বৃকোদর। রামঠাকুর মন্দিরের দখল ছাড়েননি। এ-নিয়ে কিঞ্চিৎ বিবাদ বাধার উপক্রম হয়েছিল, গ্রামবাসীরাই তার সমাধান করে দিয়েছে। গ্রামের পুব দিকে হাজারঝুরি বটগাছের নীচে জম্ভলদেবীর মূর্তি আছে একটা। শিবমন্দির থেকে দূর হয় বলে রামঠাকুর আজকাল রোজ আর সেখানে যেতে পারেন না। সেই দেবীর পূজার্চনার ভার পেয়েছে বৃকোদর। সঙ্গে-সঙ্গে তার জন্য এই ঘরটিও তৈরি করে দিয়েছে গ্রামবাসীরা। বুড়োঠাকুর কবে আছেন কবে নেই, কচিঠাকুর মন্দিরের কাছাকাছিই থাকুক।

সূর্য অস্ত যাচ্ছে। দূরে কজঙ্গলের পাহাড়ের সারি আবছা হয়ে আসছে ক্রমশ। অদূরে শাল সেগুনের জঙ্গল, মাঝে-মাঝে অজস্র পলাশ গাছ। ফুলে-ফুলে ভরে আছে পলাশ গাছ। শেষ সূর্যের আভা পড়ে লাল-লাল ফুলগুলোকে আগুনের শিখার মতো লাগে এখন।

বৃকোদরের ঘরে না ঢুকে অরুণাশ্ব মুগ্ধ চোখে জঙ্গলের রূপ দেখছিল। দেখতে-দেখতে হঠাৎ পায়রাটার কথা মনে পড়ল। ঝুড়ি চাপা দিয়ে রেখে এসেছে বটে, বেড়াল-টেড়াল ঘরে ঢুকবে না তো? যদি কিছু হয়ে যায়? সেঁজুতি কি ঘরে তুলে রাখবে না?

সহসা পেছনে উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। তন্তুবায় পল্লীর শ্রীদাম। শিবমন্দিরের দরজা থেকে চেঁচাচ্ছে, "ও কচিঠাকুর, ও রোমথাভাই, কী কাণ্ডটা হচ্ছে শুনেছেন তো?"

বৃকোদর গলা ওঠাল, "কী হয়েছে?"

"লক্ষ্মণসেন সৈন্যসামন্ত নিয়ে কর্ণসুবর্ণে এসে পড়লেন বলে!"

"তোমায় কে বলল?"

"আমি যে শাড়ি বেচতে কানসোনায় গিয়েছিলাম গো। সেখানে তো একেবারে থরহরি কম্পমান অবস্থা। লক্ষ্মণসেন নাকি কর্ণসুবর্ণর রাজার ওপর খুব রেগে গেছেন। জোর গুজব, তিনি পৌঁছেই রাজা দেবকীর্তির গর্দান নেবেন। রাজা নাকি কজঙ্গলের দিকে পালিয়ে আসছেন।"

অরুণাশ্ব লক্ষ করল, বৃকোদরের ভুরু কুঁচকে গেছে। তার গোলগাল বোকাসোকা মুখ গম্ভীর হঠাৎ। চোখ কুঁচকে কী যেন ভাবছে বৃকোদর।

মালঞ্চ গ্রামের বাসিন্দারা ভারী শান্তিপ্রিয়। তারা কারও সাতেপাঁচে থাকে না, যুদ্ধবিগ্রহের সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই। কে দেশের রাজা হল, কে দেশের মন্ত্রী হল, কেন হল, কবে হল, এ নিয়ে তারা বেশি মাথা ঘামায় না। সারাদিন ধরে যে যার পেশার কাজে ব্যস্ত রইল, দিনশেষে নিজেরা-নিজেরা একটু-আধটু আমোদ-আহ্লাদ করল, ব্যস। এভাবেই তাদের দিন কেটে যায়। তারই মাঝে পূজাপার্বণ আসে, এখানে-ওখানে ছোট-বড় মেলা উৎসব হয়, ক'দিন খুব হইচই চলে। তারপর তাদের জীবন আবার পুকুরের জলের মতো নিস্তরঙ্গ।

কিন্তু শান্ত পুকুরে ঢিল পড়লে কী হয়? পুকুরে ছোট-ছোট ঢেউ ওঠে, পুকুরের জল অনেকক্ষণ ধরে তিরতির কাঁপতে থাকে। লক্ষ্মণ সেনের কর্ণসুবর্ণ অভিযানের খবর এসে পৌঁছনোর পর ঠিক তাই

হয়েছে মালঞ্চ গ্রামে। রোজই ছোট-ছোট গুজব রটছে। চলছে জোর আলোচনা। একদিন হয়তো শোনা গেল, দেবকীর্তি ভীষণ লড়াই চালাচ্ছেন লক্ষ্মণসেনের সঙ্গে। দু'দিন পর দক্ষিণের বিল্বগ্রামের কেউ হয়তো খবর দিয়ে গেল, দেবকীর্তি নিজেই নাকি এগিয়ে গিয়ে লক্ষ্মণসেনের পা জড়িয়ে ধরেছেন। সাতদিন পর হয়তো শোনা গেল একদম অন্য খবর। লক্ষ্মণসেন কর্ণসুবর্ণে এসে দেবকীর্তিকে বন্দি করে ফেলেছেন, শিকল-বাঁধা মহাসামন্তকে কর্ণসুবর্ণর রাস্তায় হাঁটাচ্ছেন। ক'দিন পরে আরেকটা গুজবও খুব প্রবল হল। দেবকীর্তি নাকি অল্প কিছু সৈন্য নিয়ে কর্ণসুবর্ণ ছেড়ে পালিয়েছেন। কোনও ঘটনাই গ্রামের কেউ স্বচক্ষে দেখেনি। যেদিন যেটা রটে সেটাই বিশ্বাস করে গ্রামবাসী। আর গ্রামের বৃদ্ধরা মাথা দুলিয়ে বলেন, "হ্যাঁ, এমনটাই অনুমান করা গিয়েছিল বটে।"

এর মধ্যেই নতুন এক রটনা শুরু হয়ে গেল। একদম অন্য ধরনের গুজব। মালঞ্চ গ্রামে নাকি ভূত দেখা যাচ্ছে একটা। সেই ভূতটা নাকি বিশাল লম্বা, প্রায় তালগাছের মতো। দু চোখ তার ভাঁটার মতো জ্বলে, রাতভর সে নাকি মালঞ্চ গ্রামে দাপাদাপি করে বেড়ায়। কর্মকার পাড়ার আলুক নাকি একদিন তার মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিল, অমনই ভূত তাকে লাথি মেরে শুইয়ে দিয়েছে। আলুক অবশ্য ভূতের মারের কোনও প্রমাণ দেখাতে পারেনি। তবে অনেকে স্বচক্ষে দেখেছে ভূতটা নাকি উত্তরের শিবমন্দির থেকে বেরোয়, আবার শিবমন্দিরেই মিলিয়ে যায়। কেউ কেউ বলছে ওটা ভূত নয়, শিবের অনুচর নন্দিভৃঙ্গির এক জন। অনেকের মতে ওটা একটা ব্রহ্মদত্যি, থাকে মন্দিরের পেছনের বেলগাছে। বহুকাল আগে নাকি এক বামুন ওই শিবমন্দিরের ভেতরে সর্পাঘাতে মারা গিয়েছিল, তারই অতৃপ্ত আত্মা মালঞ্চ গ্রামে ফিরে এসেছে।

তা যাই হোক, ভূতের উৎপাতের একটা কিন্তু ফল হয়েছে।

boiRboi.net

মালঞ্চ গ্রামের ছেলে বুড়ো মেয়ে বউ, কেউই আর অন্ধকার নামার পর বাড়ি থেকে বের হয় না। গরমকাল, আগে সবাই সন্ধের পর বাইরে হাওয়া খেতে বেরোত, গল্পগুজব করত, সব বন্ধ।

জীবদত্তর কাছেও সন্ধেবেলা রুগি প্রায় আসে না বললেই চলে। একা-একা বসে পুঁথিপত্র পড়েন জীবদত্ত। কখনও বা টুকটাক ওষুধপত্র তৈরি করেন।

আজও খল নুড়ি নিয়ে বসেছিলেন। চরক সংহিতা দেখে-দেখে অম্লপিত্তের পাঁচন তৈরি করছিলেন একটা। নিমের ছাল পাতা ফুল মূল ফল মাড়ছিলেন চেপে-চেপে। এবার মাপমতো বিদ্ধড়ক আর যবের ছাতু দিয়ে তার সঙ্গে চিনি মেশাবেন।

সেঁজুতি দরজায় এল, "বাবা....."

জীবদত্তর হাত থেমে গেল। সস্নেহে ডাকলেন, "আয়, ভেতরে আয়।"

ঘরে রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বলছে। এদিক-ওদিকে হরেক রকম পাত্র ছড়ানো। মাটির, কাঁসার, তামার, পিতলের, রুপোর চিনেমাটির। প্রতিটি পাত্রেই কিছু-না-কিছু চূর্ণ করে রাখা আছে, প্রয়োজনমতো ব্যবহার করেন জীবদত্ত।

পাত্রগুলো বাঁচিয়ে-বাঁচিয়ে ভেতরে এল সেঁজুতি। আহ্লাদি সুরে জিজ্ঞেস করল, "কী তৈরি করছ বাবা? ভূত তাড়ানোর ওষুধ?"

জীবদত্ত হা হা হেসে উঠলেন। তাঁর মেয়ের মাথাতেও জোর ভূত চেপেছে। হাসতে-হাসতে বললেন, "তুইও ওই আজগুবি কথাকে বিশ্বাস করিস?"

"ওমা, আজগুবি কী গো! কচিবামুনদাদা যে বলল ভূতটার নাকি ইয়া লম্বা ঠ্যাং! একটা পা এখানে ফেলে, তো আরেকটা পা পড়ে বিশ হাত দূর! হাওয়ার মতো ছুটে যায়!"

"দুর, তোর বুকোদর দাদা গুলি খায়। মৌতাতের ঝোঁকে সব

BoiRboi.net

কিছুই বিদ্‌ঘুটে দেখায়।"

সেঁজুতি ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে রইল। বৃকোদর তাকে আজব আজব গল্প শোনায়, সেঁজুতির সবই বেদবাক্য মনে হয়। কচিবামুনদাদার কোনও নিন্দে শুনতে সে রাজি নয়।

জীবদত্ত মেয়েকে কাছে টানলেন। সেঁজুতি তাঁর বড় আদরের। তার মুখের একটু গোমড়া ভাবও তিনি সইতে পারেন না। নরম গলায় প্রশ্ন করলেন, "তুই কি নিজের চক্ষে কোনওদিন ভূত দেখেছিস?"

সেঁজুতি দু'দিকে মাথা নাড়ল।

"শোন, নিজের চোখে না দেখলে কোনও কিছু কখনও বিশ্বাস করবি না। ভূত দৈত্য দানো রাক্ষস খোক্ষস, কিছু না। আমি বললেও নয়।"

সেঁজুতি চোখ পিটপিট করল, "তুমি বলতে চাও ভূতপ্রেত নেই?"

"তুই যদি ভয় পেতে চাস, তা হলে আছে। তুই যদি সাহসী হোস, তা হলে নেই।"

"কী যে বলো! ছোট বামুনদাদার তো খুব সাহস, রোমথাদাদা আমায় বলেছে। তোমাদের যখন ঝম্পন রাজা ধরেছিল, সেনাপতিমশাইকে কাপালিক মারতে যাচ্ছিল, তখনও ছোট বামুনদাদা একটুও ভয় পায়নি। সে তবে কেন ভূতের কথা বলে?"

"তোকে ভয় দেখানোর জন্য বলে।"

সেঁজুতি প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, তার আগেই বাইরের দরজায় গুমগুম শব্দ। জীবদত্ত বিস্মিত হলেন। হাঁক দিলেন, "কে?"

বাইরে একটা কুকুর ঘেউ-ঘেউ করে উঠল। আওয়াজটা জীবদত্তর চেনা। উত্তরের জঙ্গল থেকে শবর এসেছে কোনও। প্রায়ই আসে, তাঁকে পাহাড় জঙ্গলের লতা পাতা শিকড় দিতে।

boiRboi.net

শবরদের সঙ্গে সবসময়ে কুকুর থাকে।

দরজা খুলে জীবদত্ত বললেন, "আরে দিদ্‌দা মিদ্‌দা যে? দুই ভাই হঠাৎ এখন?"

লাজুক হেসে ঢুকল দিদ্‌দা মিদ্‌দা। দু'জনেরই চেহারা বেঁটেখাটো, গাঁটাগোট্টা। গায়ের রং মিশমিশে কালো, তবে মুখ দুটি ভারী মিষ্টি। অদ্ভুত এক সরলতা মাখা। খালি গা, কোমর ঘিরে গাছের ছালের পোশাক, কাঁধে তীর-ধনুক। একজনের মাথায় মাটির হাঁড়ি, অন্যজনের মাথায় একরাশ গাছপালা। জঙ্গলেই বাস এই

শবরদের। ফলমূল আর জন্তুজানোয়ারের মাংস খেয়ে এরা জীবনধারণ করে।

মাথার বোঝা নামিয়ে মেঝেতে উবু হয়ে বসল দু'জনে। মিদ্দা বলল, "তোর জন্যই এলাম রে। দ্যাখ, কী এনেছি।"

প্রদীপ এনে গাছপালাগুলোকে ভাল করে নিরীক্ষণ করলেন জীবদত্ত। নিশিন্দা, কন্টকারি, বেড়েলা, চাকুলে, শালপাণি, এরণ্ড.....

পেছন থেকে সেঁজুতি কুট করে বলে উঠল, "অ্যাই, তোমরা যে বড় রাত্তিরে এলে? ভূতের ভয় নেই?"

"ভূত! সে কী জিনিস?" দুই ভাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

"কেন, তোমাদের জঙ্গলে ভূত থাকে না?"

"না তো। সে আবার কেমন জন্তু? হাতির মতো?"

"না, না।"

"ভালুকের মতো? খরগোশের মতো? কাঠবিড়ালির মতো? ময়ূরের মতো?"

"না রে বাবা, না। ভূত হল গিয়ে ভূত।"

"তা হলে নাই।"

নিশ্চিন্তে বলল দিদ্‌দা। তার বলার ভঙ্গিতে হেসে গড়িয়ে পড়ল সেঁজুতি।

জীবদত্ত লতাপাতার স্তূপ সরিয়ে রাখলেন, "ওই মাটির হাঁড়িতে কী রে? ওটা এনেছিস কেন?"

"ইটিই তো আসল জিনিস রে। ছিটে সাপ।" বলতে-বলতে হাঁড়ির মুখের সরা ফাঁক করল দিদ্‌দা, "তুই একবার সাপ চেয়েছিলি না?"

মিদ্‌দা বলে উঠল, "আজই ধরেছি। বাপ বলছিল ইটি পুড়িয়ে খাবে। আমরা দিইনি।"

জীবদত্ত উঁকি দিলেন। ঈষৎ হলদেটে রং সাপটা কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে হাঁড়িতে। গায়ে লম্বা-লম্বা টানা দাগ, ফুট-ফুট আছে অজস্র। এই সাপকে চরকের শাস্ত্রে রাজিমান সাপ বলে। এর বিষ ঠাণ্ডা, ঘুম পাড়িয়ে দেয়।

পলকের জন্য জীবদত্ত কেঁপে উঠলেন। ভেবেছিলেন আরও কিছু দিন পর, বর্ষাকাল এলে, অরুণাশ্বর ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করবেন। হাতে আজ এমন একটা সাপ জুটে গেল, ছেড়ে

boiRboi.net

দেবেন? অরুণাশ্বর ওপর কেমন যেন মায়াও পড়ে গেছে তাঁর। যদি বিষ প্রয়োগের পর তাঁর দেওয়া ওষুধে কাজ না হয়? যদি মরে যায় ছেলেটা? অরুণাশ্ব তাঁর প্রাণ বাঁচিয়েছিল, বিনিময়ে এই কি অরুণাশ্বর প্রাপ্য?

নিজেকে ধমক দিলেন জীবদত্ত। বর্ষাকালে শ'য়ে-শ'য়ে লোক সাপের কামড়ে মারা যায়। তাদের বাঁচাতে ওষুধ তৈরি করবেন তিনি। এজন্য যদি একটা প্রাণ যায়ই, ক্ষতি কী? মানুষের মঙ্গলের জন্য এইটুকু ঝুঁকি নেওয়ার প্রয়োজন আছে। তাঁর পরীক্ষা সফল হলে মোটেই অরুণাশ্ব মরবে না, বরং লোকে ধন্য-ধন্য করবে তাকে। তা-ছাড়া অরুণাশ্বর কাছে জীবদত্তর কীসের ঋণ? তিনি পায়ের শিকল খুলে দিয়ে অরুণাশ্বকে বাঁচতে সাহায্য করেছিলেন, পরিবর্তে অরুণাশ্ব তাঁকে জল থেকে উদ্ধার করেছে। উপকারে-উপকারে কাটাকুটি হয়ে গেছে। এখন অহেতুক আবেগের কোনও মানেই হয় না। বরং অরুণাশ্বর ওপর পরীক্ষা না চালালে রাজা বল্লালসেনের বিশ্বাসভঙ্গ করা হয়।

দিদ্‌দা বলে উঠল, "কী ভাবছিস কী? সাপ লিবি না?"

"হ্যাঁ, নেব।" জীবদত্তর সংবিৎ ফিরল। গলা ঝেড়ে নিয়ে বললেন, "সাপটা নিয়ে রাখি কোথায়? ....তোরা বিষটুকু বার করে দিতে পারিস না?"

"খুব পারি। একটা জায়গা দে।"

বলেই খপ করে হাঁড়ির ভেতর হাত ঢোকাল মিদ্‌দা। গলার কাছটা এক হাতে চেপে ধরে তুলেছে সাপটাকে। দিদ্‌দা অদ্ভুত কৌশলে সাপের মুখ ফাঁক করল। জীবদত্ত স্পষ্ট দেখতে পেলেন সাপের দাঁত চারটে। নীচের মাড়ির বাঁ দিকের দাঁতটা কালো, ডান দিকেরটি লাল। ওপরের ডান দিকের দাঁত শ্যামবর্ণ, বাঁ দিকেরটি হলুদ। দেখে মনে হয় সাপটির বয়স হয়েছে। প্রৌঢ় রাজিমান

boiRboi.net

সাপের বিষ সাঙ্ঘাতিক ভয়ঙ্কর।

সেঁজুতি স্তম্ভিত হয়ে দেখছে। সাপটার চেরা জিভ বেরিয়ে আসছে ঘন-ঘন, শিউরে উঠছে সেঁজুতি। জীবদত্তর হাত চেপে ধরছে। সে জীবনে কোনওদিন এত কাছ থেকে সাপ দেখেনি। তার তালু বুঝি শুকিয়ে গেছে। বারকয়েক ঢোক গিলে বলল, "সাপের বিষ দিয়ে কী করবে বাবা?"

উত্তর না দিয়ে একটা শূন্য রুপোর পাত্র শব্বর ভাইদের দিকে এগিয়ে দিলেন জীবদত্ত। মিদ্দা পাত্র হাতে ধরেছে, দিদ্দা বিচিত্র প্রক্রিয়ায় চাপ দিল সাপের চোয়ালে। টুপ-টুপ বিষ পড়ছে পাত্রে। ফোঁটা-ফোঁটা করে।

দরজার বাইরে কুকুরটা হঠাৎ ডেকে উঠল। কান্নার মতো।

সন্ধে পেরিয়ে রাত্রি নেমে গেছে অনেকক্ষণ। থেকে থেকে বাতাস বইছে একটা, বৈশাখ রাতের মিঠে বাতাস। কাছেপিঠের বাঁশঝাড়ে ঝিঁঝি ডেকে চলেছে অবিরাম, একটানা সুরে ঝমঝম করছে অন্ধকার। চাঁদ ওঠেনি এখনও, আকাশে শুধুই তারার মেলা। মালঞ্চ গ্রাম ক্রমে নিঝুম হয়ে এল।

অরুণাশ্ব নিজের দাওয়ায় বসে ছটফট করছিল। খিদেয়। জীবদত্তর বাড়িতে সন্ধে সন্ধে আহার পর্ব শেষ হয়ে যায়। বাড়ির লোকের খাওয়া চুকলে তবে ডাক পড়ে অরুণাশ্বর। আজ কোনও উচ্চবাচ্য নেই কেন? অরুণাশ্ব বলে যে একটা প্রাণী আছে সে-কথা কি ভুলেই গেলেন সেঁজুতির মা?

BoiRboi.net

অভিমানে অরুণাশ্বর চোখে জল এসে গেল। প্রথম যেদিন এ বাড়িতে পা রেখেছিল সেদিনকার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। তার খাওয়া দেখে মাথায় হাত দিয়েছিলেন সেঁজুতির মা। গজগজ করে বলেছিলেন, এতটা করে ভাত খাবে রোজ। লজ্জায় পরদিন থেকে খাওয়া কমিয়ে দিয়েছে অরুণাশ্ব, পেট না ভরলেও দ্বিতীয়বার ভাত চায় না। জীবদত্তর স্ত্রী মুখের কথা খসানোর আগেই তাঁর হুকুম তামিল করে অরুণাশ্ব, প্রাণপণে তাঁর মন পাওয়ার চেষ্টা করে। তবু এই অবিচার?

অরুণাশ্ব উঠে দাঁড়াল। ভেজা চোখে তাকাল জীবদত্তর বাড়ির দিকে। টুকটাক শব্দ শোনা যাচ্ছে, আলোও জ্বলছে। অর্থাৎ বাড়ির লোকজন এখনও ঘুমোয়নি। আশ্চর্য, সেঁজুতিও কি ভুলে গেল তার রোমথাদাদাকে এখনও খেতে দেওয়া হয়নি?

ঘরে টিমটিম প্রদীপ জ্বলছে। চাটাইয়ের শয্যায় এসে শুয়ে পড়ল অরুণাশ্ব। চোরা রাগ দপদপ করে উঠছে বুকে। গাধার খাটুনি সে খাটছে সারাদিন, তারপরও দু' মুঠো ভাতের জন্য এত হেনস্থা?

অরুণাশ্ব তড়াক করে আবার উঠে বসল। কটমট চোখে নিজের ঘরখানাকে দেখল একবার। অতি ছোট্ট ঘরখানা সম্পূর্ণ আসবাবহীন। একটা শুধু দড়ি ঝুলছে কাপড় গামছা রাখার জন্য, আর এক কোণে জলের কলসি। হাত বাড়িয়ে কলসি টেনে মুখের কাছে ধরে ঢকঢক জল খেল অনেকটা। খিদে একটু কমল যেন। আবার শুতে গিয়েও চোখ পড়েছে ঘরের অন্য কোণে। সাত আটখানা ছোবড়া না ছাড়ানো নারকেল স্তূপ হয়ে আছে। কাল সকালে উঠে ছাড়িয়ে দিতে হবে। নারকেল দিয়ে কী যেন রাঁধবেন সেঁজুতির মা।

অদ্ভুত এক হাসি খেলে গেল অরুণাশ্বর ঠোঁটে। স্তূপের পাশে রাখা কাটারিটা হাতে তুলে নিয়েছে। প্রবল বিক্রমে নারকেল

ছাড়ানো শুরু করে দিল। ঠকাঠক কাটারি চালাচ্ছে। ইচ্ছে করে। জোরে জোরে। যদি রাতদুপুরে বিদ্‌ঘুটে শব্দ শুনে অরুণাশ্বর কথা ওঁদের খেয়াল হয়।

দেখতে দেখতে অরুণাশ্ব ঘেমে নেয়ে গেল। তবু থামছে না, এক ভাবে চালিয়ে যাচ্ছে হাত। দু'পায়ের মাঝে নারকেল রেখে হাতের চাপে ছাড়াচ্ছে ছোবড়া, আওয়াজ উঠছে চড়চড়। হাতের উলটো পিঠ দিয়ে ঘাম মুছল কপালের। হঠাৎই ভীষণ চমকে উঠল। কী একটা ছায়া নড়ে গেল না দেওয়ালে? ভাবতেই শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা স্রোত। এ গাঁয়ের সেই ভূতটা নয় তো?

দু-এক পল অরুণাশ্ব স্থির। তারপর খুব ধীরে-ধীরে ঘাড় ঘোরাচ্ছে। দেওয়াল পর্যন্ত চোখ ঘুরতেই বেদম হাসি পেয়ে গেল। ধুস্, ও তো নিজেরই ছায়া। তারই নড়াচড়ার সঙ্গে-সঙ্গে কেঁপে কেঁপে উঠছে ছায়া, দুলছে।

আপন মনে বেশ খানিক হেসে নিল অরুণাশ্ব। কত সহজে মানুষ ভুল করে! কত সামান্য কারণে মানুষ ভয় পায়! অথচ একটু চোখ-কান সজাগ রাখলেই সব ভয় দূরে সরে যায়। এই ভূতের গল্পটা কাল বামুনঠাকুরের কাছে করতে হবে।

বৃকোদরের কথা মনে পড়তেই অরুণাশ্ব সামান্য উদাস। আজ বিকেলেও বামুনঠাকুর তাকে হরেক রকম প্রশ্ন করছিল। সেই পুরনো অপ্রিয় প্রসঙ্গ। আজ অবশ্য প্রশ্নের ধারা একটু অন্যরকম ছিল। তোমার ভাই যে খঞ্জরটি হারিয়ে ফেলেছিল, তুমি জানতে অরুণাশ্ব? তোমার ভাইয়ের সঙ্গে তো তোমার সকাল-বিকেল সর্বক্ষণ দেখা হত, একবারও সে তোমায় বলেনি? অথচ সে তোমার কাকাকে বলেছে?

খঞ্জরটা থাকত কোন ঘরে? তোমার ভাইয়ের, না কাকার? ও, তোমার ভাই কাকা-কাকিমার ঘরেই থাকত! ওই খঞ্জর হারানো

নিয়ে তোমাদের বাড়ির কাজের লোকদের কিছু বলেননি কাকা? তাদেরও কেউ তোমায় কিছু বলেনি কোনওদিন?

কাকাকেই কি সন্দেহ করছে বামুনঠাকুর? অরুণাশ্বর মনেও এ ধরনের একটা চিন্তা ইদানীং উঁকি দেয় বটে। বিচার হয়ে যাওয়ার পর একটিবারের জন্যও কাকা অরুণাশ্বর সঙ্গে দেখা করতে এলেন না, এমনকী বিক্রমপুরের ঘাটেও না। কবিরাজমশাইয়ের কথা শুনেও মনে হয়নি কাকা তাঁর সঙ্গে কখনও দেখা করেছেন। অর্থাৎ তার বেঁচে থাকা মরে যাওয়া নিয়ে কাকা মোটেই ভাবিত নন। তা হলে বিচারকক্ষে তাঁর অজ্ঞান হয়ে যাওয়াটা কি অভিনয়? বাবা অবশ্য মাঝে-মাঝে ঠাট্টা করে বলতেন নয়নাগ খুব ভাল অভিনয় করতে পারে ...

বাইরে কীসের যেন একটা শব্দ। কান খাড়া করল অরুণাশ্ব। উঠোনের মাঝখানে বাঁশের ডগায় পাখির খোপ করে দিয়েছে। রাতে প্রায়ই বেড়াল ঘোরাঘুরি করে, পাখি ঠিক টের পেয়ে যায়, ডানা ঝাপটায় খুব। আজও উপদ্রব শুরু হয়েছে নাকি? অথবা এও মনের ভুল, একটু আগে ভূতের মতো?

অরুণাশ্ব ঠাট্টাচ্ছলে গলাখাঁকারি দিল, "কে রে বাইরে? ব্রহ্মদত্যি নাকি?"

মিহি স্বর ভেসে এল, "না। আমি সেঁজুতি।"

মুহূর্তের জন্য চমকে উঠেও হেসে ফেলল অরুণাশ্ব, "যাক, এতক্ষণে আমার খাওয়ার কথা মনে পড়ল!"

সেঁজুতি দরজায় এসে দাঁড়াল। চকিতে একবার নিজেদের বাড়ির দিকটা দেখে নিয়েই ঢুকে এল ঘরে।

অরুণাশ্ব অবাক চোখে সেঁজুতির দিকে তাকাল, "কী হল? চলো, যাই খেতে।"

সেঁজুতি জোরে জোরে দু'দিকে মাথা নাড়ল। কাঁদো কাঁদো

boiRboi.net

গলায় বলল, "তোমার আজ খাওয়া নেই রোমথাদাদা।"

"সে কী! কেন?"

"বাবার নির্দেশ।"

"কেন, আমি কী দোষ করেছি? এই তো আমি নারকেলগুলোও অর্ধেক ছাড়িয়ে রেখেছি..."

সেঁজুতি উত্তর দিল না। একটুক্ষণ চুপ থেকে খপ করে অরুণাশ্বর হাত চেপে ধরেছে, "তোমার ভীষণ বিপদ রোমথাদাদা। তুমি এক্ষুনি পালাও।"

"বিপদ? আমার?" অরুণাশ্ব অবাক হতে গিয়েও হেসে ফেলল, "আমার আবার নতুন কী বিপদ হবে?"

"সে আমায় জিজ্ঞেস কোরো না। তুমি এক্ষুনি পালাও। এক্ষুনি।"

"কোথায় পালাব?"

"যেখানে খুশি। আর কখনও এখানে ফিরে এসো না।"

অরুণাশ্বর ভুরু কুঁচকে গেল। সেঁজুতি বাচ্চা মেয়ে বটে, কিন্তু তার কথাগুলো তো ঠিক ছেলেমানুষের মতো মনে হচ্ছে না!

গম্ভীর মুখে বলল, "কী হয়েছে খুলে বলো তো।"

"বললাম না, আমায় জিজ্ঞেস কোরো না। এক্ষুনি চলে যাও। এক্ষুনি।"

অরুণাশ্ব কড়া স্বরে বলল, "তোমায় বলতেই হবে।"

অরুণাশ্বর চোখের দিকে তাকাল সেঁজুতি। তারপরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, "বাবা সাপের বিষ জোগাড় করেছেন। তোমার শরীরে সেটা মিশিয়ে দেবেন।"

অরুণাশ্বর গলা থেকে আর্তনাদ ছিটকে এল, "কেন?"

"সাপের বিষের ওষুধ তৈরি করবেন বাবা। মাকে বলছিলেন।" সেঁজুতি আবার ফুঁপিয়ে উঠল, "ওষুধে কাজ না হলে তুমি মরে

boiRboi.net

যাবে।"

অরুণাশ্বর মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। ওষুধ-বিষুধ নিয়ে তার ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে এ তো জানতই অরুণাশ্ব, তা বলে সাপের বিষ? এমন ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার কথা কেন আগে মাথায় আসেনি? মহারাজ বল্লালসেন অবশ্য বলেছিলেন, তোমার জীবনটাই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের গবেষণার জন্য উৎসর্গ করে দেওয়া হল। কবিরাজ জীবদত্ত এখন তোমাকে নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারেন। তুমি মরে গেলেও ...।

কিন্তু মৃত্যুর কথা শোনা এক, আর মৃত্যুর বিভীষিকা ঘাড়ের কাছে ফোঁস ফোঁস করা আর এক। দুই অনুভূতির মধ্যে কোনও তুলনা চলে না।

বিড়বিড় করে অরুণাশ্ব বলল, "তা হলে মরেই যাব?"

"কেন মরবে? পালাও।"

অরুণাশ্ব ম্লান হাসল, "আমার পালানোর উপায় নেই সেঁজুতি। আমার কপালের লিখন আবার আমায় ফিরিয়ে আনবে। আমি ধরা পড়ে যাব।"

"বনজঙ্গলে চলে যাও। কিংবা অন্য দেশে। দূরে, অনেক দূরে।"

মুহূর্তের জন্য বিচলিত হয়ে পড়ল অরুণাশ্ব। পা দুটো চঞ্চল হয়ে উঠছে। যাবে পালিয়ে? যা থাকে কপালে? পাটলিপুত্র চলে যাবে? কিংবা উজ্জয়িনী? কিংবা বিজয়নগর? সে দেশে বল্লালসেনের হুকুম চলবে না, কেউ তার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।

পরক্ষণেই অরুণাশ্ব থমকাল। মনে পড়ে গেল ভিক্ষু সুভদ্রর কথা। দু'দিকে মাথা নেড়ে বলল, "তা হয় না সেঁজুতি। এ এক ধরনের প্রতারণা। আমি তোমাদের আশ্রিত। আশ্রয়দাতাকে প্রতারণা করাটা অপরাধ। বৈদ্যমশাই ক'দিনের জন্য হলেও আমায় মুক্ত জীবনের স্বাদ দিয়েছিলেন। তাঁকে আমি ঠকাতে পারব না।"

"ঠকানোর কী আছে?" সেঁজুতি ফস করে বলে উঠল, "প্রাণে বাঁচার চিন্তা করাতে কোনও দোষ নেই।"

অরুণাশ্ব মনে মনে বলল, "আমার প্রাণটাই তো রয়েছে তোমার বাবার জন্যে।" মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "এখানেই বা প্রাণে বাঁচব না ধরে নিচ্ছ কেন? হয়তো তোমার বাবার ওষুধে....."

"অসম্ভব। কী সাঙঘাতিক সাপের বিষ তোমায় দেওয়া হবে তুমি জানো না রোমথাদাদা।"

" জানতে চাইও না। তুমি ঘরে যাও। এত রাতে তুমি বেরিয়ে এসেছ দেখলে তোমার মা রাগ করবেন।"

"মোটেই না। মা'ই তো আমাকে পাঠালেন। আমি ঘরে বসে বসে কাঁদছিলাম, মা আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন তোর রোমথাদাদাকে এক্ষুনি পালাতে বল।"

এই মুহূর্তে ঘরে বাজ পড়লেও বুঝি এত স্তম্ভিত হত না অরুণাশ্ব। মানুষকে সে কত কম চেনে! আপাতদৃষ্টিতে যাঁকে নিষ্ঠুর মনে হয়, তাঁর মধ্যেও কত করুণা লুকিয়ে থাকে! ভিক্ষু সুভদ্র ঠিকই বলেছিলেন। জীবনের কঠিন পরীক্ষায় নামার সুযোগ পেয়েছে সে। তাকে মন শক্ত করতেই হবে। জেনেশুনে জীবদত্তর মনে সে আঘাত দিতে পারে না। সে যখন কোনও অপরাধ করেনি, কোনও অমঙ্গলও তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

সেঁজুতি আবার মিনতির সুরে বলল, "তুমি যাবে না রোমথাদাদা? .... যাও না, লক্ষ্মীটি।"

অরুণাশ্ব মুখ ঘুরিয়ে নিল।

রাত্রির শেষ যাম। মিশমিশে অন্ধকারে ডুবে আছে পৃথিবী। রাতচরা পাখিরাও বুঝি এখন ডাকতে ভুলে গেছে। নিস্তব্ধতা ছিঁড়ে জঙ্গলের দিক থেকে শেয়াল ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে পর পর

অনেক শেয়াল ডাকছে। তারা থামতেই আবার সব নিঝুম।

তখনই অরুণাশ্ব গলাটা শুনতে পেল, "অরুণাশ্ব ওঠো। দরজা খোলো।"

অরুণাশ্ব উঠে আগল খুলে দিল, "আসুন।"

"তুমি জেগে আছ অরুণাশ্ব? ঘুমোওনি?"

অরুণাশ্ব সোজাসুজি জীবদত্তর মুখের দিকে তাকাল, "আমি প্রস্তুত আছি বৈদ্যমশাই।"

পলকের জন্য ইতস্তত করে ভেতরে এলেন জীবদত্ত। প্রায় নিভন্ত প্রদীপের সামনে গিয়ে বসলেন। হাতে তাঁর অনেক জিনিস। পাত্র রয়েছে দুটো-তিনটে, দড়ি রয়েছে, শলাকা রয়েছে....। একটি পাত্র থেকে সামান্য তেল ঢাললেন প্রদীপে। সলতে উস্‌কে দিলেন। আলো উজ্জ্বল হল। সেই আলোতে অরুণাশ্ব স্পষ্ট দেখতে পেল জীবদত্তর দু'চোখ টকটকে লাল। সারারাত ধরে কি ওষুধ তৈরি করছিলেন বৈদ্যমশাই?

অরুণাশ্ব মৃদু স্বরে প্রশ্ন করল, "আমাকে এখন কী করতে হবে?"

"তুমি জানো আমি কীজন্য এসেছি?"

অরুণাশ্ব উত্তর দিল না। আলগা হাসল।

জীবদত্ত কী যেন ভাবছেন। আনমনে নাড়াচাড়া করছেন পাত্রগুলোকে। খানিক সময় নিয়ে বললেন, "তুমি আমাকে ভুল বুঝো না অরুণাশ্ব। আমি সজ্ঞানে তোমার ক্ষতি চাই না। আমি শুধু আমার ধর্ম পালন করছি।"

"আজ্ঞে আমি জানি।"

"তোমায় তখন সেঁজুতি এসে কিছু খাবার খাইয়ে যায়নি তো?"

অরুণাশ্ব নাড়া খেয়ে গেল। জীবদত্ত তা হলে জানেন সেঁজুতি এসেছিল? জীবদত্তও কি চেয়েছিলেন অরুণাশ্ব পালিয়ে যাক?

শান্ত গলায় অরুণাশ্ব বলল, "না বৈদ্যমশাই। সন্ধের পর থেকে

boiRboi.net

আমি কিছুই খাইনি।"

"এবার তা হলে শুয়ে পড়ো।"

অরুণাশ্ব শুয়ে পড়ল। তার ডান বাহুটি আলোর দিকে টেনে নিলেন জীবদত্ত। আবেগহীন গলায় বললেন, "আশা করি আমার ওষুধ সার্থক হবে। যদি না হয়, যদি মারা যাও, মৃত্যুর আগে আমায় ক্ষমা করে দিয়ো।"

অরুণাশ্ব চোখ বুজল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টের পেল তীক্ষ্ণ শলাকাটা ঢুকে গেছে তার কব্জিতে। শলাকাটা ঘুরছে, কী যেন এক ঠাণ্ডা তরল প্রবেশ করছে শরীরে। ভীষণ জ্বালা করে উঠল জায়গাটা। যেন কোটি কোটি পিঁপড়ে একসঙ্গে কামড় বসাচ্ছে।

হঠাৎ অরুণাশ্ব চিৎকার করে বলতে চাইল, "আমাকে মারবেন না বৈদ্যমশাই। আমি বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই।"

কোনও স্বরই ফুটল না গলায়। চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। ঘুম নামছে চোখে। মরণ ঘুম।

কজঙ্গলের মহাসামন্ত বিক্রমসিংহার্জুনদেব চিন্তিত মুখে গোঁফ চুমরোলেন, "দেবকীর্তি তো আমাদের মহা ভাবনায় ফেলে দিলেন দেখছি।"

"হুম।" অপরমন্দারের মহাসামন্ত কপিলদেবের ছোটখাটো গাঁট্টাগোট্টা চেহারাটি দুলে উঠল। ঘড়ঘড়ে গলায় বললেন, "কিছু একটা করতে হয়। হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না।"

চম্পার মহাসামন্ত দুর্জয়সিংহের ঠোঁটে বাঁকা হাসি, "অবশ্যই।

boiRboi.net

আপনারা এখন হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে লক্ষ্মণসেন আপনাদের পিপড়ের মতো টিপে মেরে ফেলবে।"

গভীর রাতে কজঙ্গলের নিবিড় বনে মিলিত হয়েছেন তিন মহাসামন্ত। অস্থায়ী শিবির গড়া হয়েছে বেশ কিছু। জঙ্গলের মধ্যে একটু ফাঁকা জায়গা দেখে। তিন মহাসামন্তের জন্য তিনটি বড় শিবির, আর তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে আসা বিশ-পঁচিশজন সৈন্যের জন্য ছোট-ছোট শিবির। সৈনিকরা এখন বিশ্রাম নিচ্ছে, কিন্তু তিন মহাসামন্তর চোখে ঘুম নেই। এইমাত্র খবর এসেছে, লক্ষণসেন কর্ণসুবর্ণ পৌঁছনোর আগেই ভরাডুবি হয়েছে দেবকীর্তির। ভয়েই হোক, কি লোভেই হোক, কর্ণসুবর্ণর বেশিরভাগ সৈন্যই হুড়মুড়িয়ে গিয়ে যোগ দিয়েছে লক্ষ্মণসেনের দলে। বেচারা দেবকীর্তি দণ্ডভুক্তির পথে পালিয়েছেন, সঙ্গে তাঁর মাত্র তিনশো সৈন্য। এমন অবস্থায় তিনি কজঙ্গলের দিকেও আসতে সাহস পাচ্ছেন না, ভেবেও পাচ্ছেন না কী করবেন।

শিবিরের দরজায় দেবকীর্তির দূত। দুর্জয়সিংহ তার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন, "তোমাকে খুব শ্রান্ত মনে হচ্ছে!"

দূতটির ঘাড় ঝুলে গেল। তার পোশাকের বেশ শতচ্ছিন্ন দশা, মাথার চুল উসকোখুসকো, হাত পা অনেক জায়গায় ছড়ে গিয়েছে। সম্ভবত জঙ্গল ঢুঁড়ে এই শিবির বার করতে গিয়েই। অবসন্ন গলায় সে বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। শরীর আর বইছে না।"

"যাও, তুমি এখন একটু বিশ্রাম করে নাও। আমরা তোমাকে খানিক পরে ডাকছি।"

এক প্রহরীকে ডেকে প্রয়োজনমতো নির্দেশ দিয়ে দিলেন দুর্জয়সিংহ। দূত তার সঙ্গে চলে গেল।

একটুক্ষণ তিনজনই চুপ। মনে-মনে পরিকল্পনা ভাঁজছেন।

বিক্রমসিংহার্জুন বলে উঠলেন, "আমার মনে হয় দেবকীর্তির

boiRboi.net

কথা ভুলে যাওয়াই ভাল। ওকে আর আমাদের কোনও কাজে লাগবে না।"

"অর্থাৎ দেবকীর্তিকে ছাড়াই লক্ষ্মণসেনের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন?" কপিলদেব বললেন।

"অবশ্যই। দুর্জয়সিংহ যখন আমাদের দিকে এসে গেছেন, তখন আর ভাবনা কী? আমাদের তিনজনের মিলিত বল লক্ষ্মণসেনের চেয়ে কিছু কম হবে না।"

দুর্জয়সিংহ হাসলেন একটু। তিনি জানেন, বিক্রমসিংহার্জুনের সৈন্যসংখ্যা দশ হাজারও নয়। কপিলদেবের অবশ্য তার চেয়ে কিছু বেশি। আর তাঁর নিজের সৈন্যসামন্ত প্রায় তিরিশ হাজার। অর্থাৎ কিনা লক্ষ্মণসেনের সঙ্গে লড়াইটা তাঁরই হবে, এঁরা শুধু যুদ্ধক্ষেত্রের শোভা বাড়াবেন। অথচ কথার কী কায়দা! যেন কজঙ্গল আর চম্পা সমান সমান! কপিলদেব তাঁকে বলেছিলেন বিক্রমসিংহার্জুন লোকটি অতি খল। এখান থেকে কজঙ্গলের দুর্গ মাত্র আট ক্রোশ পশ্চিমে, দুর্জয়সিংহের প্রথমে ইচ্ছে ছিল সেখানেই তিন মহাসামন্ত জড়ো হবেন। কপিলদেব তাঁকে নিষেধ করলেন। বিক্রমসিংহার্জুন দেব নাকি কব্জায় পেলে দুর্জয়সিংহকে বন্দিও করে ফেলতে পারেন। নিন্দুকেরা বলে, লোকটা নাকি নিজের বাবাকে গুপ্ত ঘাতক দিয়ে হত্যা করিয়েছিলেন। হতেই পারে। যে খেলায় এখন ইনি দেবকীর্তিকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন, সবই সম্ভব।

দুর্জয়সিংহ শক্ত গলায় বললেন, "আমি চাই দেবকীর্তিও আমাদের সঙ্গে..."

"থাকুন তবে।" বিক্রমসিংহার্জুন গা মোচড়ালেন, "কিন্তু কীভাবে যুদ্ধ শুরু হবে, কোথায় দেবকীর্তির সঙ্গে মিলব, সেসব তো আগে ঠিক করা দরকার।"

কপিলদেব বললেন, "এ বিষয়ে আমি কিছু ভেবেছি। আমার

সৈন্যরা ভাগীরথীর ওপারে অপেক্ষা করছে। আমি নির্দেশ পাঠালে তারা নদী পার হয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আসবে, এবং কাল দুপুরেই পৌঁছে যাবে এখানে। আর রাজা দুর্জয়সিংহের সৈন্য তো প্রস্তুতই রয়েছে। চম্পার পাহাড় পার হয়ে, ভাগীরথীর এ-পার দিয়ে তারা তো এগিয়েই আসছে। তারা কি কাল এখানে এসে পড়তে পারবে না?"

দুর্জয়সিংহ ঘাড় নাড়লেন, "আশা তো করছি।"

"ব্যস, তা হলেই হবে। রাজা বিক্রমসিংহার্জুনের বাহিনীর তো এখানে আসতে সময়ই লাগবে না।"

"হুম। তারপর?" বিক্রমসিংহার্জুন চোখ বড়-বড় করলেন।

"তারপরই শুরু হবে আমাদের আসল যুদ্ধযাত্রা। রাতটাকে আমরা নষ্ট করব না। আঁধার নামলেই আমরা কর্ণসুবর্ণ পাড়ি দেব। সক্কলে। সমস্ত সৈন্যসামন্ত নিয়ে। আমাদের ঘোড়া আর হাতি পৌঁছে যাবে কর্ণসুবর্ণর দোরগোড়ায়।

"কিন্তু পদাতিক না পৌঁছলে যুদ্ধে নামব কী করে?" বিক্রমসিংহার্জুন খিঁচিয়ে উঠলেন, "ঘোড়া হাতি লক্ষ্মণসেনের ঢের বেশি আছে। আমি জানি।"

"সে আমিও জানি। তাই তো বলছি, আমার পরামর্শটা চুপচাপ শুনুন।" কপিলদেব উঠে দাঁড়ালেন। দু-এক পল ভাবলেন কী যেন। তারপর হঠাৎই কানখাড়া করলেন। সন্দিগ্ধ স্বরে বললেন, "কীসের একটা শব্দ হল না?"

"কই, না তো!"

"আমি তো কিছু শুনতে পেলাম না!"

"উঁহু। আমার কেমন যেন মনে হল। বাইরে থেকে কেউ আমাদের কথা শুনছে না তো?"

দুর্জয়সিংহ ইশারায় কপিলদেবকে কথা চালিয়ে যেতে বলেই

boiRboi.net

দ্রুত বেরিয়ে এসেছেন শিবিরের বাইরে। একটু দূরে-দূরে খুঁটিতে মশাল জ্বলছে। বুনো জন্তুরাও কাছে ঘেঁষবে না, জায়গাটা আলোকিতও থাকবে—এ তারই বন্দোবস্ত। প্রহরীরাও ঘুরে বেড়াচ্ছে ইতস্তত, হাতে খোলা তলোয়ার। শিবিরের চারপাশে একবার চক্কর খেয়ে এলেন দুর্জয়সিংহ। সন্দেহজনক কেউ কোথাও নেই। আশপাশের গাছে-গাছে এলোমেলো ঘোড়া বাঁধা। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ঢুলছে ঘোড়াগুলো। এদিকওদিক দিয়ে কেউ ঢুকলে ওরা কি চঞ্চল হয়ে পড়ত না? সৈনিকের ঘোড়া কখনও অসতর্ক হয় না।

হাসতে হাসতে ফিরে এলেন দুর্জয়সিংহ, "দুর, সব আপনার মনের ভুল।"

"হবেও বা।" কপিলদেবকে সামান্য চিন্তিত দেখাল। চাপা স্বরে বললেন, "আমার পরিকল্পনার এই জায়গাটাই আসল। শুনুন মন দিয়ে। আমরা দিনের বেলা কোনও যুদ্ধ করবই না।"

"সারাদিন থাকব কোথায়? ছাউনি ফেলে?" দুর্জয়সিংহ চোখ সরু করলেন, "লক্ষ্মণসেনের সৈন্যরা কি অন্ধ?"

"তাদের অন্ধই করে দেব। রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারে আশ্রয় নেব আমরা। ঘোড়া হাতি রাখব শহর থেকে অনেকটা দূরে। আমি খবর নিয়েছি, রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের প্রধান ভিক্ষু মিত্ররক্ষিত সেন রাজাদের ওপর ভীষণ ক্ষুব্ধ। তাঁকে আমি আশ্বাস পাঠিয়েছি কর্ণসুবর্ণ থেকে সেনবংশকে আমরা হটিয়ে দেবই। রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের অবস্থা এখন ভাল নয়, ওদের প্রাচীন বাড়িখানা ভেঙে-ভেঙে পড়ছে, ওটি সংস্কার করার জন্য অর্থও দেব বলেছি। বৌদ্ধদের তো হাল এখন খুব খারাপ, আবার লুপ্ত গরিমা ফিরে আসার এই সুযোগ তাঁরা কক্ষনো হাতছাড়া করবেন না। পরদিন রাতে পদাতিকরা পৌঁছলেই রাতের অন্ধকারে আমরা...। লক্ষ্মণ সেন আমাদের অতর্কিত হানায় বিপর্যস্ত হবেনই।"

MAY 009
732
94743-89235

"কিন্তু দেবকীর্তির সঙ্গে আমরা মিলব কী করে?" দুর্জয়সিংহ প্রশ্ন ছুড়লেন।"

"সেটাও ভেবেছি। আজই রাতে ওই দূতকে ফেরত পাঠিয়ে দেব দেবকীর্তির কাছে। কাল সন্ধ্যায় দণ্ডভুক্তি থেকে সোজা কর্ণসুবর্ণর দিকে রওনা হবেন তিনি। দেবকীর্তির কিছু বিশ্বস্ত অনুচর নিশ্চয়ই এখনও কর্ণসুবর্ণে আছে। উনি সোজা রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারে চলে আসবেন, ওঁর মাধ্যমে আমরা ওঁর অনুচরদের সঙ্গে যোগাযোগ করব। তারা লক্ষ্মণসেনের সেনাবাহিনীর হাঁড়ির খবর আমাদের এনে দিতে পারবে। যদি সুযোগ পাই, লক্ষ্মণ সেনের কোনও মহাগণস্থকেও আমরা উৎকোচে বশীভূত করব।"

বিক্রমসিংহার্জুনের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল, "অতি উত্তম পরিকল্পনা।"

দুর্জয়সিংহের ভুরুতে ভাঁজ। কর্ণসুবর্ণর বেশি শক্তিক্ষয় করায় তাঁর ইচ্ছে নেই, তাঁর লক্ষ্য গৌড়। এঁরা গৌড় আক্রমণ করার মতলব করেছেন বলেই তিনি স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছেন। শুধু গৌড় নয়, তাঁর উচ্চাশা আরও বেশি। মিথিলা জয় করার বাসনা তাঁর অনেকদিনের। গৌড়েশ্বর হতে পারলে তাঁর হাতে প্রভূত বল আসবে, অর্থও। বিক্রমসিংহার্জুন আর কপিলদেবকেও সরিয়ে দিতে তাঁর অসুবিধে হবে না। তিনিই সবচেয়ে বেশি শক্তিমান, তাঁর চিন্তা কীসের! গৌড় হাতে এলে মিথিলাও তাঁর হবেই।

শিবিরের দীপাধারের উজ্জ্বল আলোয় সঙ্গীদের মুখ দেখে নিলেন দুর্জয়সিংহ। শুধু তাঁর সম্মতির প্রতীক্ষাতেই দুই মহাসামন্ত উৎসুক চোখে তাকিয়ে আছেন।

মনের ভাব মনেই চেপে গাল ছড়িয়ে হাসলেন দুর্জয়সিংহ। বললেন, "আপনার পরিকল্পনা নিখুঁত। কিন্তু..."

"কিন্তু কী?" একসঙ্গে দুটো গলা ঠিকরে এল।

"লক্ষ্মণসেনকে যদি হারাতে পারি, তখন কোনও নতুন সমস্যা আসবে না তো?"

"কীরকম?"

"ধরুন, আমাদের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব বেধে গেল।"

"কী নিয়ে?"

"কে কী পাব তাই নিয়ে।"

দুই মহাসামন্তই চুপ। পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছেন।

দুর্জয়সিংহই আবার বললেন, "দেখুন, একটা কথা পরিষ্কার বলে রাখি। কর্ণসুবর্ণয় আমার কোনও আগ্রহ নেই। লক্ষ্মণসেনের সঙ্গে জেতা-হারাতেও আমার কিছু এসে যায় না। আমি গৌড় চাই। আপনারা স্পষ্ট করে বলুন, এতে আপনাদের কোনও আপত্তি আছে কি না।"

"না, না, আপত্তি কীসের?" কপিলদেব তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "গৌড় জয়ের বাসনা তো আসলে ছিল দেবকীর্তির। তিনি যখন হীনবল হয়ে পড়েছেন...গৌড় দখল করতে পারলে গৌড়েশ্বর আপনিই হবেন। আমরা আপনাকে সাহায্যও করব। অবশ্য বিনিময়ে..."

"বলুন। বলে ফেলুন।"

"বিক্রমসিংহার্জুনের কথা আমি জানি না। আমার দাবি, গৌড়ের রাজকোষের অর্ধেক। এ-কথা আমি দেবকীর্তিকেও বলেছিলাম।"

"আমি তাও চাই না। বিক্রমসিংহার্জুন তড়িঘড়ি বলে উঠলেন, "আমার ইচ্ছে ছিল গৌড়ের রাজকোষের বাকি অর্ধেক পাওয়ার। তবে সে বাসনা আমি ত্যাগ করছি। আমি এখন কর্ণসুবর্ণ চাই।"

"সে কী কথা! দেবকীর্তি তা হলে যাবেন কোথায়?"

"যে রাজা তাঁর নিজের সৈন্যদের বশে রাখতে পারেন না, তাঁকে কর্ণসুবর্ণ ফিরিয়ে দেওয়ার তো কারণ দেখি না।"

boiRboi.net

দুর্জয়সিংহ দেখলেন, বিক্রমসিংহার্জুনের মুখে শয়তানের হাসি। তিনি অত্যন্ত সাহসী পুরুষ, তবু তাঁর বুকটাও ক্ষণিকের জন্য যেন কেঁপে উঠল। মনে মনে ভেবে নিলেন, এই কালসাপটাকে সর্বদা চোখে চোখে রাখতে হবে। প্রথম সুযোগেই এঁকে নিপাত করাই হবে তাঁর পবিত্র কর্তব্য।

হেসে বললেন, "তাই হবে। দেবকীর্তিকে নয়, আপনার হাতেই তুলে দেব।"

বাইরে আবার যেন কীসের একটা আওয়াজ। এবার বেশ স্পষ্ট। দুটো ঘোড়া ডেকে উঠল হঠাৎ।

ভীষণ চমকে তিন মহাসামন্তই ছুটে এলেন বাইরে। বনপথে খসখস শব্দ হচ্ছে, কেউ যেন ছুটে পালাচ্ছে।

তিন মহাসামন্ত একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন, "কে? কে যায়?"

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে চার অশ্বারোহী। ঘোড়া চলেছে দুলকি চালে, শুকনো পাতায় শব্দ বাজছে মচমচ। রাত্রির এখন তৃতীয় যাম, অন্ধকার এই ঘোর অরণ্যে মাঝে- মাঝেই বুনো জন্তুর ডাক শোনা যায়। তা এ নিয়ে অবশ্য অশ্বারোহীদের চিন্তা নেই, তাদের সকলের হাতেই রয়েছে জ্বলন্ত মশাল। জন্তু-জানোয়াররা আগুনকে ভয় পায়।

Boikhoi.net

চার এই অশ্বারোহী চার মহাসামন্তের দূত। এই রাতেই তাদের ছুটতে হচ্ছে নিজ-নিজ কাজে, কারওরই মন খুব প্রসন্ন নয়। শিবির

থেকে ক্রোশ দুই পথ পশ্চিমে গিয়ে যে-যার মতো আলাদা হয়ে যাবে। দেবকীর্তির দূত যাবে দক্ষিণে। কপিলদেব আর দুর্জয়সিংহের দূত উত্তরে দৌড়বে। আর বিক্রমসিংহার্জুনের দূত আরও আরও পশ্চিমে। বেশ খানিকটা পথ চলে এসেছে চারজন। যেতে-যেতে টুকটাক কথা বলছে। বোধ হয় ঘুম কাটাতে।

কপিলদেবের দূত বলল, "এই রাতদুপুরে ছোটার কোনও মানে হয়? কাল ভোরে রওনা হলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হত!"

দুর্জয়সিংহের দূত বলল, "রাজামশাইদের খেয়াল রে ভাই। এখানে কি আমাদের ইচ্ছে চলবে?"

দেবকীর্তির দূত ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলল, "তোমরা তো তাও সারাটা দিন আজ শিবিরে ছিলে। খেয়েছ-দেয়েছ, ঘুমিয়েছ। আমি তো সেই সকাল থেকে ছুটছি। ওফ্, দণ্ডভুক্তি থেকে কজঙ্গলের এই বন কি কম দূর! ভেবেছিলাম রাতটা অন্তত বিশ্রাম পাব...."

বিক্রমসিংহার্জুনদেবের দূত বিজ্ঞের মতো বলে উঠল, "উপায় ছিল না রে ভাই। তোমরা তো সব কথা জানো না, আমি জানি। জঙ্গলের আশেপাশে যে গ্রামগুলো আছে, সেখানে নাকি লক্ষ্মণ সেনের অনেক চর ঘোরাফেরা করছে। দিনের বেলা কোনও অচেনা অশ্বারোহী দেখলেই লক্ষ্মণসেনের কাছে বার্তা পাঠিয়ে দেবে। তাই রাজামশাইরা চান অন্ধকার থাকতে থাকতেই তোমরা অনেকদূর চলে যাও।"

"তাই হবে।" দুর্জয়সিংহের দূত ঘাড় নাড়ল, "রাজামশাইরা বোধ হয় আঁধারে আঁধারেই সব কাজ শেষ করতে চান। তাই না আমাদের সৈন্যবাহিনীকে দাঁড়িয়ে পড়ার নির্দেশ পাঠাচ্ছেন। ওরা রওনা হবে কাল সন্ধেয়, জঙ্গলে পৌঁছবে সেই পরশু ভোরে।"

"আমাদের রাজারও একই নির্দেশ।" কপিলদেবের দূত বলল।

"অর্থাৎ কিনা লক্ষ্মণসেনের সঙ্গে যুদ্ধ একদিন পিছিয়ে গেল।"

boiRboi.net

"ভালই হল।" দেবকীর্তির দূত মাথা দোলাল, "আমাদের রাজামশাইও এর মধ্যে রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারে পৌঁছে যেতে পারবেন।"

কোত্থেকে একটা হাওয়ার ঝাপটা এল জঙ্গলে। মশালের আগুন কেঁপে উঠল দপদপ। বাতাসটা চলে যেতেই চারদিক একেবারে নিঝুম।

সহসা ঘোড়াগুলো দাঁড়িয়ে পড়েছে। লাগাম ধরে টানাটানি করছে সওয়ারিরা, তবু এগোচ্ছে না। সামনের দু'পা শূন্যে তুলে চিহিহি ডাক ছাড়ছে।

"কী হল রে বাবা, ভয়-টয় পেল নাকি?"

"বাঘ-টাঘের গন্ধ পেল?"

"কিংবা হাতি!"

হঠাৎ একটা হাড়-হিম-করা কণ্ঠস্বর শুনে কথোপকথন থমকে গেল।

"কোথায় যাস তোরা? এই রাতে?"

ভীষণ কেঁপে উঠেছে চার দূত। ইতি-উতি তাকাচ্ছে। মশালের আলো যতটুকু যায়, ততটুকু তাও বুঝি চোখ চলে। তার পরে মিশমিশে কালো। ভয়াল আঁধার।

আবার স্বর শোনা গেল, "আমাকে তোরা দেখতে পাবি না। যা প্রশ্ন করছি তার উত্তর দে। কোথায় চলেছিস?"

দেবকীর্তির দূত কোনওক্রমে জিভ দিয়ে শুকনো তালু ভিজিয়ে নিল। ফ্যাসফেসে গলায় বলল, "আ আপনি কে?"

"আমি কে! হা হা। তোরা জানতে চাস, আমি কে!" অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ল ভারী কণ্ঠস্বর। হাসতে-হাসতেই হাসিটা হঠাৎ অনেক দূরে সরে গেল যেন। আবার ফিরে এসেছে, পাক খাচ্ছে নিবিড় অরণ্যে। বিটকেল হাসির দমকে গাছে-গাছে ঘুমন্ত

boiRboi.net

পাখিরা জেগে উঠল, একযোগে কিচমিচ করছে। চার দূতের নাকের সামনে দিয়ে একটা বিশাল সাদা প্যাঁচা উড়ে গেল। ক'টা বাদুড় ডেকে উঠল করুণ সুরে, মানুষের বাচ্চার মতো।

চার দূত কাঁপছে ঠকঠক। অবশ হাত থেকে মশাল খসে পড়ল।

কণ্ঠস্বর গর্জন করে উঠল, "জানিস, এই জঙ্গলে আমি দশ হাজার বছর ধরে আছি! এ-জঙ্গল আমার এলাকা। রাতের বেলা কোন সাহসে এখানে ঢুকেছিস তোরা?"

"আজ্ঞে, আমাদের কোনও দোষ নেই।" কপিলদেবের দূত মিনমিন করে বলল, "রাজামশাইদের হুকুম কিনা..."

"তোদের রাজামশাইদের নিকুচি করেছে। এখন আমি তোদের ঘাড় মটকে রক্ত খাব, চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাব। দেখি তোদের কোন রাজামশাই এসে এখন বাঁচায়!"

"প্রাণে মারবেন না। দোহাই আপনার। আমরা এখনই শিবিরে ফিরে যাচ্ছি।"

কাকুতিমিনতি শেষ হওয়ার আগেই প্রচণ্ড এক আঘাতে ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়েছে চার দূত। হাউমাউ করে উঠতে যাচ্ছিল, গাছ থেকে নেমে এল তালগাছের মতো ঢ্যাঙা ছায়া-ছায়া শরীর। লম্বা-লম্বা পা ছড়িয়ে খানিক তফাতে দাঁড়িয়েছে। তার হাতটা ধাঁই করে লম্বা হয়ে গেল হঠাৎ। সরু লম্বা হাত ভয়ানক জোরে হাতুড়ির মতো এসে পড়ল চারজনের মাথায়। চার দূত জ্ঞান হারাল।

মুহূর্তে বিশাল লম্বা রূপ থেকে স্বাভাবিক মানুষের আকার নিল ছায়ামূর্তি। পায়ে-পায়ে এগিয়ে এসে ঘোড়া চারটের লাগাম তুলে নিল হাতে। শিস দিয়ে-দিয়ে ঘোড়াদের ডাকছে। বাধ্য শিশুর মতো তাকে অনুসরণ করল ঘোড়ারা। একটা গাছের সঙ্গে চারটে ঘোড়াকেই বেঁধে ফেলল ছায়ামূর্তি। অজ্ঞান চার দূতকেও টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এল গাছের কাছে। কোমর থেকে একটা দীর্ঘ রজ্জু

বার করে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধল তাদের। চার টুকরো বস্ত্রখণ্ড চেপে চেপে চারজনের মুখে ঢুকিয়ে দিল।

হিসহিস করে বলল, "এবার তোদেরও মজা দেখাচ্ছি। তোদের রাজামশাইদেরও।"

আঁধার ফিকে হয়ে এসেছে। ভোরের আর দেরি নেই। কজঙ্গলের রাজার দুর্গের কাছেই, যেখান থেকে কজঙ্গলের বন শুরু হয়েছে, একটি মাঝারি আকারের শিবির। বাইরে জনা চার-পাঁচ প্রহরী বসে-বসে ঘুমোচ্ছে, তাদের হাতের বল্লম গড়াগড়ি খাচ্ছে মাটিতে।

শিবিরটি বেশ সুসজ্জিত। ভেতরে মখমলের বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে নিদ্রা যাচ্ছেন বিরোচন। ঘুমের ছন্দে তাঁর ভুঁড়িটি উঠছে-নামছে, নাক ডাকছে ফরর-ফরর। ঘুমের মধ্যেই তাঁর ঠোঁটের কোণে মাঝে-মাঝে হাসি ফুটে উঠছে। কখনও বা হাতের মুঠো শক্ত হচ্ছে, কখনও ছটফট করে উঠছে পা।

স্বপ্ন দেখছেন বিরোচন। দেখছেন, প্রকাণ্ড এক মাঠে যোদ্ধার বেশে হা-রে-রে-রে করে ছুটে চলেছেন তিনি, হাতে খোলা তলোয়ার। উলটো দিক থেকে ধেয়ে এল হিড়িম। তার পেছনে

আগডুম বাগডুম। তার পেছনে যে আরও কতজন, লেখাজোখা নেই। তলোয়ার চালিয়ে একের পর এক আক্রমণকারীকে কচুকাটা করে চলেছেন বিরোচন। হিড়িমের মুন্ডু মাটিয়ে লুটিতে পড়ল, দুম করে তাতে লাথি কষালেন বিরোচন। ওই আসছেন রাজা ঝম্পন। পাতার পোশাক পরে। নাচতে নাচতে। হাতে ইয়া বড় এক লাঠি। তলোয়ারের কোপে লাঠি দু'টুকরো, তবু ঝম্পন তেড়ে আসছেন। একদম কাছে এসে গেলেন, একদম কাছে। এ কী করছেন ঝম্পন? সরু লাঠি সোজা ঢুকিয়ে দিয়েছেন বিরোচনের নাকে, ঘোরাচ্ছেন।

বিরোচন ঘুমের ঘোরেই বিড়বিড় করে উঠলেন, "অ্যাই অ্যাই, কী হচ্ছে কী? সুড়সুড়ি লাগছে না!"

ঝম্পনের ভ্রূক্ষেপ নেই। লাঠি ঘুরিয়েই চলেছেন।

প্রাণপণে লাঠিটাকে নাক থেকে বার করার চেষ্টা করলেন বিরোচন। পারছেন না। বেজায় হাঁচি পাচ্ছে। সামলাতে পারলেন না নিজেকে। হেঁচে উঠলেন, হ্যাঁঅ্যাঅ্যাচ্চো।

হাঁচিটা স্বপ্নের হাঁচি নয়, সত্যিকারের হাঁচি। হাঁচির দাপটে ঘুম ভেঙে ছত্রখান। পড়াং করে চোখ খুলে যেতেই নিদারুণ চমক!

তাঁর মুখের সামনে বৃকোদরের মুখ!

হাসছে বামুনটা। হাতে একটা ঘাস, নাড়াচ্ছে নাকের সামনে। ওই দিয়েই ব্যাটা নাকে সুড়সুড়ি দিচ্ছিল। ইস, ঝম্পনটা বেঁচে গেল!

বিরোচন গর্জে উঠতে যাচ্ছিলেন, তুমি কোত্থেকে! তার আগেই বৃকোদর হাতের ইশারায় চুপ করতে বলল। তারপর ফিসফিস করে বলল, "একদম নিচু গলায় কথা বলুন। নইলে প্রহরীরা জেগে যাবে।"

"তাতে আমার কী রে বিট্‌লে বামুন....."

কথা শুরু করার সঙ্গে-সঙ্গে বিরোচনের মুখ চেপে ধরেছে

boiRboi.net

বৃকোদর। তার চোখের হাসি-হাসি ভাব পলকে বদলে গেল। ভীষণ নিচু স্বরে, কিন্তু কড়া গলায় বলল, "যা বলছি চুপচাপ শুনুন। আপনাকে এক্ষুনি আমার সঙ্গে যেতে হবে।"

"কোথায়?"

"কাজ আছে। রাজা বল্লালসেনের কাজ।"

বিরোচনের চোখ গোল গোল হয়ে গেল। ঘুম পুরোপুরি ছেড়ে গেছে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন। সন্দিগ্ধ গলায় বললেন, "তুমি আমায় হুকুম করার কে?"

ট্যাঁক থেকে একটা চাকতিমতো কী বার করল বৃকোদর। বিরোচনের চোখের সামনে নাচাল, "চেনেন এটা?"

বিরোচনের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল, "এ তো আমাদের মহারাজ বল্লালসেনের পাঞ্জা! তুমি পেলে কোত্থেকে?"

"সে বৃত্তান্ত নয় পরেই জানবেন। এখন আমার সঙ্গে আসুন।"

একজন প্রহরী জেগে গেছে। দরজায় উঁকি মারছে, "কে? কে ভেতরে?"

চোখের পলক পড়ার আগেই বিদ্যুৎবেগে লাফ দিয়েছে বৃকোদর। হ্যাঁচকা টানে প্রহরীটিকে নিয়ে এল বিছানার কাছে, মুখ চেপে ধরে। অদ্ভুত কায়দায় তার ঘাড়ে একটা আঘাত করল। সঙ্গে-সঙ্গে নেতিয়ে পড়ল প্রহরী।

বিরোচন হাঁ। মুখে কথা সরছে না। কোনওক্রমে ঢোক গিলে বললেন, "তুমি কে ভাই?"

"বললাম তো, সে উত্তর পরে হবে।" একঝলক প্রহরীটাকে দেখল বৃকোদর, "এ তো ভারী বিপদ হয়ে গেল। ভেবেছিলাম আপনাকে নিয়ে চুপিচুপি কেটে পড়ব, কাকপক্ষীও টের পাবে না। কিন্তু তা তো আর হচ্ছে না। একে এভাবে ফেলে রেখে গেলে বাকিরা উঠে চেঁচামেচি করবে, খোঁজখবর করবে.....। অবশ্য একটা

boiRboi.net

উপায় আছে।"

বিরোচন উপায়টা জিজ্ঞেস করতে ভরসা পেলেন না।

বৃকোদর নিজেই বলল, "বাকি ক'টাকেও অজ্ঞান করে, হাত-মুখ বেঁধে ভেতরে রেখে যাই। কী বলেন? কারও আর নড়াচড়া করার অবস্থা থাকবে না। কী সেনাপতিমশাই, আমার সঙ্গে হাত লাগাতে পারবেন তো?"

অজান্তেই বিরোচনের ঘাড় একদিকে কাত হয়ে গেল, "আজ্ঞে পারব।"

মালকোঁচা মারা ধুতি পরে হনহনিয়ে হাঁটছে বৃকোদর। বনপথ ধরে। পথ অবশ্য কথার কথা; শাল, সেগুন, অর্জুন, শিমুল, জারুল, আরও কত চেনা-অচেনা গাছের ফাঁক দিয়ে আন্দাজে আন্দাজে চলা। মাঝে-মাঝে শুকনো ঝোপঝাড় কাটিয়ে কাটিয়ে চলতে হচ্ছে তাদের। গ্রীষ্মের জঙ্গলে সাপখোপ পোকামাকড়ের উপদ্রব খুব কম নয়, পা'ও ফেলতে হয় সাবধানে। মাটির দিকে নজর রেখে।

সূর্য উঠেছে একটু আগে। গাছগাছালি ভেদ করে চুঁইয়ে চুঁইয়ে এসে পড়ছে সোনালি আলো। বাতাস এখনও গরম হয়নি, ভারী মিঠে আমেজ লেগে আছে হাওয়ায়। আলোছায়ায় মাখা সকালের বনভূমি এখন অতি মনোরম। রাতের ভয়ঙ্করের আভাসটুকুও নেই।

বিরোচনও আসছেন সঙ্গে-সঙ্গে। তবে বৃকোদরের সঙ্গে তাল মেলাতে পারছেন না। প্রায় ছুটতে হচ্ছে তাঁকে। পরনে তাঁর যোদ্ধার বেশ, তারও ভার কম নয়। এই সকালেও ঘামছেন,

হাঁপাচ্ছেন জিভ বার করে।

বৃকোদর হাঁটার গতি একটু কমাল। বিরোচনকে পাশে নিয়ে চলতে চলতে বলল, "খুব তো সুখে নিদ্রা যাচ্ছিলেন! মহারাজের কাজ কদ্দূর এগিয়েছে, অ্যাঁ?"

"কী কাজ?"

"হাতি ধরা? ক'টা হাতি জোগাড় হল, অ্যাদ্দিনে?"

"আজ্ঞে, একটাও নয়।"

"কেন?"

"আজ্ঞে, কী করব বামুনঠাকুর! বিক্রমসিংহার্জুন যে আমাকে লোকই দিচ্ছেন না!" বিরোচনের স্বর কাঁদো-কাঁদো, "যেদিন থেকে কজঙ্গলে এসে পৌঁছেছি, তিনি শুধু বলছেন আজ হবে, কাল হবে, তাড়া কীসের...। এই তো দু'দিন আগে কোথায় যেন বেরিয়ে গেলেন। যাওয়ার আগে বলে গেলেন, ফিরে এসেই আপনার হাতির বন্দোবস্ত করব। আপনি ততদিন এই শিবিরে বিশ্রাম করুন...। বোঝেনই তো, হাতি ধরতে গেলে কয়েকটা পোষা শিক্ষিত হাতি লাগে। কুনকে হাতি। বিক্রমসিংহার্জুন যতক্ষণ না সে হাতি আমায় দিচ্ছেন ততক্ষণে আমার হাত পা বাঁধা।"

বিরোচনের কথা শুনতে ভারী মজা লাগছিল বৃকোদরের। তাকে হঠাৎ খুব সমীহ করে কথা বলতে শুরু করেছেন সেনাপতিমশাই। প্রহরীদের ওপর তাঁর হম্বিতম্বি দেখেই কি বিরোচনের শ্রদ্ধা এল? না কি মহারাজের পাঞ্জা দেখে?

হাসি চেপে বৃকোদর গলাখাঁকারি দিল। গলা আরও গম্ভীর করে বলল, "সেইজন্যই বুঝি আপনি শুধু খেয়ে ঘুমিয়ে সময় কাটাচ্ছেন?"

"আজ্ঞে না। আমি আমার কাজ অনেকটা এগিয়ে রেখেছি।"

"কীরকম?"

"হাতি ধরার কয়েকটা ফাঁদ তৈরি করে ফেলেছি।"

"কোথায়?"

"এই জঙ্গলেই।"

বৃকোদর এক পল কী যেন ভেবে নিয়ে বলল, "একটাও কি কাছাকাছি আছে? আমাকে দেখাতে পারেন?"

"কেন পারব না? আসুন।"

বিরোচন একটু দাঁড়ালেন। চোখ কুঁচকে তাকালেন এদিক ওদিক। যেন জঙ্গলে তাঁর অবস্থানটাকে বুঝে নিতে চাইছেন। তারপর উত্তর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "ওই তো, ওদিকেই আছে একটা। সামান্য এগোলেই..."

সত্যিই কাজ করেছেন বটে বিরোচন। খানিকটা ঝোপঝাড় পেরিয়ে উত্তরে এগোতেই একটা ফাঁকা মতো জায়গায় অনেকটা জুড়ে গাছপালা লতাপাতা স্তূপ হয়ে আছে। হাত দিয়ে ডালপালা একটু সরিয়েই বৃকোদরের চোখ জ্বলজ্বল, "আরেব্বাস, এ যে বিশাল গর্ত খুঁড়েছেন!"

"হেঁ হেঁ, একটা হাতি নয়, একসঙ্গে দুটো হাতি ওই ফাঁদে পড়বে।"

"তা এত বড় গর্তটা খুঁড়ল কে? বিক্রমসিংহার্জুনের লোক?"

"মোটেই না। আমার সৈন্যরা। এইসব কাজের পালা শেষ করেই তো আমি বিক্রমসিংহার্জুনের কাছে লোকলশকর চাইতে গিয়েছিলাম।"

বৃকোদর ভুরু কুঁচকোল, "তা আপনার সেই সৈন্যরা গেল কোথায়?"

"কজঙ্গলের দুর্গে। বিক্রমসিংহার্জুন ওদের ওখানেই থাকতে বলেছেন।"

বৃকোদর হাসি চাপতে পারল না। রাজা বল্লালসেনের এই

গণস্থটি যে এত বোকা, ধারণাই ছিল না তার।

হাসতে হাসতে বলল, "শুনুন সেনাপতিমশাই, আপনার ঘটে এতটুকু বুদ্ধি নেই। আপনার সৈন্যরা কজঙ্গলের দুর্গে বন্দি হয়ে আছে। আপনিও বন্দি ছিলেন, তবে দুর্গের বাইরে।"

"যাহ।" বিরোচনের চোখে অবিশ্বাস, "বিক্রমসিংহার্জুন আমাদের বন্দি করতে যাবেন কেন?"

"কারণ আপনি মহারাজ বল্লালসেনের লোক। আপনার সৈন্যরাও।"

"তো?"

"বিক্রমসিংহার্জুন মহারাজ বল্লালসেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। উঁহুঁ, চোখ কপালে তুলবেন না। যা বলছি মন দিয়ে শুনুন। চার বিদ্রোহী মহাসামন্তের চার দূতকে আমি জঙ্গলে বেঁধে রেখে এসেছি। তাদের দায়িত্ব এখন আপনাকে নিতে হবে।"

"আ আ আমি?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি। যা যা বলব সেইমতো কাজ করে যাবেন, কোনও চিন্তা নেই। তবে মনে রাখবেন, কাজে যদি কোনও ত্রুটি ঘটে, মহারাজ বল্লালসেন আপনাকে ক্ষমা করবেন না।"

বিরোচন ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে। ওই থলথলে নাদুসনুদুস পেটুক বামুনটা, যাকে তিনি সেই বিক্রমপুর থেকে শুধু অপছেন্দাই করে এসেছেন, সে কোন জাদুমন্ত্রবলে এমন দাপুটে লোক হয়ে গেল? বিশ্বাসই হয় না! একে না ঘাঁটিয়ে এর হুকুম তামিল করে যাওয়াই ভাল। তাতে হয়তো আখেরে লাভ আছে।

বৃকোদর পুব মুখে হাঁটা শুরু করল। পিছু পিছু বিরোচন। দণ্ড দুয়েকের মধ্যেই তারা পৌঁছে গেছে সেই গাছতলায়, যেখানে বাঁধা আছে চার দূত। চারজনেরই জ্ঞান ফিরে এসেছে, ছটফট করছে। বৃকোদরদের দেখেই তাদের গলা দিয়ে আওয়াজ উঠল, গঁঅ গঁঅ।

বৃকোদর তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, "কী হে ব্রাহ্মণরা, বুঝতে পারছ, কে তোমাদের বেঁধে রেখে গেছে?"

চার জোড়া চোখ বড় বড় হল।

"আমার পোষা ভূত। আমি নিষেধ করায় তোমাদের মারেনি।"

ভয়ে ভয়ে চোখ চাওয়াচাওয়ি করল চারজন।

"এখন কি তোমরা মরতে চাও?"

চারটে মাথাই প্রবল বেগে ঘটঘট নড়ছে।

"তা হলে একদম ট্যাঁ ফোঁ-টি নয়। বাঁধন আমি খুলে দিচ্ছি, আমাদের পেছন পেছন এসো।" বলতে বলতে বিরোচনকে দেখাল বৃকোদর, "এঁকে দেখছ তো? ইনি একজন অত্যন্ত রাগী সেনাপতি। পালানোর চেষ্টা করলেই গলা একেবারে কুচুং।"

সঙ্গে সঙ্গে বিরোচন তাঁর পুরনো মেজাজে। খাপ থেকে তলোয়ার বার করে গলা সপ্তমে চড়িয়েছেন, "খবরদার। খবরদার।"

সামনে পেছনে ঘোড়ার পিঠে বৃকোদর আর বিরোচন। দু'জন দু'জন করে চার বন্দিকে বসানো হয়েছে বাকি দুই ঘোড়ার পিঠে। তাদের হাত মুখের বাঁধন খোলা হয়নি, দড়ির এক প্রান্ত বিরোচন ধরে আছেন, অন্য প্রান্ত বৃকোদর।

দুপুরের মধ্যেই মালঞ্চ গ্রামে পৌঁছে গেল সকলে।

গোটা গ্রাম ভেঙে পড়েছে বন্দিদের দেখতে। বৃকোদর অনেক কষ্টে তাদের সামলালো। বিরোচনকে দেখিয়ে বলল, "ইনি আমাদের মহারাজা বল্লালসেনের এক বীর সেনাপতি। এই চার মহাসামন্তের দূতকে ইনি একাই লড়াই করে বন্দি করেছেন।"

বিরোচন গোঁফ চুমরোলেন।

এক গ্রামবাসী সশ্রদ্ধ চোখে বিরোচনকে জিজ্ঞেস করল, "এদের নিয়ে এখন কী করবেন সেনাপতিমশাই?"

boiRboi.net

বিরোচনের আগে বৃকোদর উত্তর দিল, "সেনাপতিমশাই স্থির করেছেন আপাতত এরা এই গ্রামেই থাকবে। তোমাদেরই কারও ঘরে। তোমরা পালা করে পাহারা দেবে। সেনাপতিমশাইও এখন তোমাদের অতিথি, তোমরা এঁর যত্নআত্তি করো। উনি আবার আমাকে নিয়ে আজ অভিযানে বেরোবেন।"

"আপনিও যাবেন? আজই?"

"যেতেই হবে। সেনাপতিমশাইয়ের হুকুম।"

"কোথায় যাবেন কচিঠাকুর?"

বিরোচন হুঙ্কার ছাড়লেন, "তা জেনে তোমাদের কী হবে! বামুনঠাকুর যা বলছেন, তাই করো।"

গ্রামবাসীরা সিঁটিয়ে গেল। একদিনেই কত বিস্ময় তাদের সামনে! কচিঠাকুর ঘেড়ায় চড়েছেন! একটা আস্ত সেনাপতি এসেছেন তাদের গ্রামে! সঙ্গে এক গণ্ডা বন্দি...! আর বেশি কৌতূহল দেখানো বোধ হয় ঠিক নয়।

উৎকণ্ঠা মাখা চোখে অরুণাশ্বকে দেখছিলেন জীবদত্ত। কীসের যেন শোরগোল হচ্ছে, তবু এক মুহূর্তের জন্যও তিনি অরুণাশ্বকে ছেড়ে বেরোননি। প্রায় দেড়দিন হয়ে গেল, এভাবেই ছেলেটার পাশে বসে আছেন তিনি। সেঁজুতির মা'র শত ডাকাডাকিতেও নড়ছেন না। ঘন ঘন নাড়ি দেখছেন অরুণাশ্বর, পাশে রাখা তালপাতার পুঁথিতে কী দেখলেন লিখে রাখছেন। দুটি মাটির পাত্রে রাখা আছে ওষুধ। ত্রিকটু আতইচ, কুড়, ঝুল, রেণুক, তগরপাদুকা আর কট্‌কী একসঙ্গে জলে পিষে মধুর সঙ্গে রেখেছেন এক পাত্রে। অন্য পাত্রে হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা আর সমূল কাঁটানটের মিশ্রণ। দুটো পাথরের বাটিতে দই আর ঘি'ও রাখা আছে। তিন দণ্ড অন্তর অন্তর মাপমতো মিশ্রণ ঢেলে দিচ্ছেন অরুণাশ্বর মুখে। সঙ্গে দই বা

ঘি।

অরুণাশ্ব পড়ে আছে দু' হাত ছড়িয়ে। চোখ বন্ধ। দেখে মনে হয় সে এখনও অচেতন। কিন্তু সত্যি সত্যি তা নয়। কাল দুপুরের দিকে তার প্রথম জ্ঞান এসেছিল, আবার কিছুক্ষণ পরেই, সে অচেতন হয়ে যায়। মধ্য রাত্রির পর আবার জ্ঞান ফিরেছে, তারপর এখনও পর্যন্ত সে আর চেতনা হারায়নি।

সেঁজুতিও বসে আছে ঘরে। কালও সারাদিন খুব কেঁদেছে মেয়েটা, এখনও তার মুখে ফোলা ফোলা ভাব। তার হাতে একটি পাখা, অরুণাশ্বকে সমানে হাওয়া করে চলেছে সে। মাঝে-মাঝে ঝুঁকে পড়ে দেখছে তার রোমথাদাদার মুখ চোখ।

অরুণাশ্বর ঠোঁট বুঝি সামান্য নড়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে জীবদত্ত নিচু হলেন, "কিছু বলবে, অরুণাশ্ব?"

অরুণাশ্বর গলা থেকে অস্ফুট স্বর বার হল, "মা...."

সেঁজুতি উদ্‌গ্রীব হল, "জল খাবে রোমথাদাদা?"

অরুণাশ্বর চোখ দুটো অল্প খুলেই বন্ধ হয়ে গেল। জড়ানো গলায় সে উচ্চারণ করল, "জ্বালা, বড় জ্বালা।"

"কমে যাবে। একটু ধৈর্য ধরো।" জীবদত্ত অরুণাশ্বর বাঁ হাতের কব্‌জি ধরে রইলেন একটুক্ষণ।

সন্তর্পণে হাতটা নামিয়ে রাখতেই সেঁজুতি প্রশ্ন করল, "নাড়ি কেমন বুঝলে বাবা?"

"ধীর। তবে আগের তুলনায় নিয়মিত।" বড় একটা শ্বাস টানলেন জীবদত্ত, "মনে হয় এ-যাত্রা আমি সফল হয়েছি। আমার ওষুধ কাজ করেছে। মাত্রাটাও ভুল হয়নি।"

সেঁজুতির চোখ চকচক করে উঠল, "তাই?"

"উঁহুঁ, এখনই আনন্দ কোরো না। এখনও বিপদ কাটেনি। বিষের প্রভাব কমার সময়েই রক্ত চলাচলে নানান ধরনের গোলযোগ দেখা

boiRboi.net

দেয়। এখনই শ্বাসকষ্ট বাড়ে। হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়।" কথা বলতে বলতে অরুণাশ্বর মুখ অল্প ফাঁক করলেন জীবদত্ত। মধু সহ ওষুধটা ঢেলে দিলেন।

কণ্ঠনালীর ওঠানামা দেখে বোঝা যায় ওষুধ নামল অরুণাশ্বর গলা বেয়ে। ঠোঁটে জিভ বোলাচ্ছে অরুণাশ্ব। সামান্য ঘি অরুণাশ্বর ঠোঁটে লাগিয়ে দিলেন জীবদত্ত।

সেঁজুতির মা দরজায় এসেছেন, "বেলা যে গড়িয়ে গেল, তোমরা খাবে না?"

জীবদত্ত বললেন, "এই যাই।"

"ছেলেটাকে কি কোনও পথ্যি দেওয়া যাবে?"

"আরেকটু দেখি। তারপর দুধ দিও।"

হঠাৎই বাইরে হাঁকডাক শোনা গেল, "কই, অরুণাশ্ব কোথায়?"

তিন জোড়া চোখ দরজার দিকে ঘুরল। বৃকোদর। হন্তদন্ত মুখে দাওয়ায় এসে দাঁড়িয়েছে।

অরুণাশ্বর ঘরে বাবা মা মেয়ে তিনজনকে একসঙ্গে দেখে অবাক হয়েছে বৃকোদর। পরশু সন্ধে থেকে সে টো টো করে বেড়াচ্ছে, অরুণাশ্বর বৃত্তান্ত সে কিছুই জানে না। জীবদত্তও ব্যাপারটা গোপন রেখেছেন, গ্রামে পাঁচ কান করেননি।

ঘরের লোকজনের মুখ চোখ বৃকোদরের স্বাভাবিক ঠেকল না। দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকে অসাড় পড়ে থাকা অরুণাশ্বকে দেখে প্রায় আঁতকে উঠল, "কী হয়েছে বদ্যিমশাই? ছেলেটার এই দশা কেন?"

জীবদত্তের মাথা নত হয়ে গেল। আমতা আমতা স্বরে বললেন, "আমি ওর ওপর সর্পবিষ প্রয়োগ করেছি।"

"সর্বনাশ! এ কী করেছেন?" বৃকোদর ধপ করে বসে পড়ল, "আমি যে অরুণাশ্বকে নিয়ে যেতে এসেছিলাম বদ্যিমশাই!"

pathagar.net

অরুণেন্দু ভবন লাইব্রেরি
বই নং 732
তারিখ 7.5.2009
ফোন

আলুকের গৃহে অধিষ্ঠান করছেন বিরোচন। বন্দিদের রাখা হয়েছে গোপ পল্লীতে। চার ঘোড়া বাঁধা আছে সেখানেই, বলদেবের গোশালায়।

ঘোর মধ্যাহ্নেও আলুকের কুঁড়েঘরে তিলধারণের ঠাঁই নেই। এইমাত্র পরিতৃপ্ত ভোজন সেরে উঠেছেন বিরোচন, পান চিবোতে-চিবোতে এসে বসেছেন ভিড়ের মধ্যিখানে। শোনাচ্ছেন তাঁর বীরত্বের কাহিনী। উৎসুক শ্রোতাদের চোখ বড় বড়।

ভিড় থেকে একজন প্রশ্ন করল, "চারজনের সঙ্গেই কি আপনার লড়াই হয়েছিল সেনাপতিমশাই?"

"হয়নি আবার!" বিরোচন গোঁফে তা দিলেন, "সাঙ্ঘাতিক যুদ্ধ হয়েছিল। ওরা দূর থেকে বর্শা ছুড়ল, আমি ঢাল দিয়ে আটকে দিলাম। তারপর ওরা তেড়ে এল তলোয়ার নিয়ে। কিন্তু আমার সঙ্গে পারে? সেবার হরিকেলের সঙ্গে যুদ্ধে আমি একাই চল্লিশজনের মোকাবিলা করেছিলাম, আর এরা তো মাত্র চার। এক দণ্ডেই চারটেকে শুইয়ে দিলাম।"

আলুক ভয়ে ভয়ে বলে উঠল, "কিন্তু ওদের দেহে তো কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই সেনাপতিমশাই!"

"থাকবে কী করে! তলোয়ার হাত থেকে খসে যেতেই ওরা এমন পায়ে পড়ে গেল... তার ওপর তোমাদের বামুনঠাকুরও মিনতি করলেন, যেন ওদের প্রাণে না মারি..." বলতে বলতে ইয়া বড় হাই তুললেন বিরোচন, "জানোই তো, বীরদের দয়াধর্ম থাকা

উচিত। তাই না..."

"কচিঠাকুরের সঙ্গে আপনার দেখা হল কী করে?"

কোঁত করে একটা ঢোক গিললেন বিরোচন, "মানে ... উনি বোধ হয় জঙ্গলে প্রাতর্ভ্রমণে গিয়েছিলেন। সেই সময়েই আমার লড়াই দেখে... আমাদের পূর্বপরিচয় ছিল তো। তারপর আমিই ওঁকে দিয়ে লোকগুলোকে বাঁধালাম..."

বৃকোদর বাইরে দাঁড়িয়ে বিরোচনের বাগাড়ম্বর শুনছিল। উফ, পারেনও বটে সেনাপতিমশাই! কিছু কিছু মানুষ বোধ হয় এরকম থাকে, তিন কড়ির কাজ করে, তেত্রিশ কড়ির মুখ ছোটায়।

বিরোচনকে ডাকতে গিয়েও ডাকল না বৃকোদর। আলুকের দরজায় আরও একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পায়ে পায়ে পাশের ঘোড়ানিমগাছটার নীচে এসে দাঁড়াল। জীবদত্ত তাকে মহা সমস্যায় ফেলে দিয়েছেন। মনে মনে যে পরিকল্পনা সে ছকেছে, অরুণাশ্বর সাহায্য ছাড়া কিছুতেই তা সফল হতে পারে না। বিরোচনের গায়ে জোর থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু সে মহা নির্বোধ। তার ওপর নির্ভর করে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দেওয়া যায় না। বড় জোর লোকটা হুকুম তামিল করতে পারে, ব্যস। তুলনায় অরুণাশ্ব অনেক টগবগে। তেজী। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করার ক্ষমতা তার আছে।

কিন্তু সেই অরুণাশ্বকে এক্ষুনি এক্ষুনি চাঙ্গা করতে জীবদত্ত যা বিধান দিয়েছেন, সেও অতি মারাত্মক। আলকুশি বীজ, অশ্বগন্ধা আর গোরক্ষচকুলের মিশ্রণ খাওয়াতে হবে অরুণাশ্বকে। দ্রাক্ষারসের মদিরা সহযোগে। তবে এতে নাকি বিপদেরও আশঙ্কা আছে। হঠাৎ রক্ত চলাচলের গতি বৃদ্ধি পেয়ে সন্ন্যাস রোগের আশঙ্কা থাকে এতে। পরিণামে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুও ঘটতে পারে।

কী যে এখন করে বৃকোদর? দুরূহ রাজকর্ম সাধনের জন্য

অরুণাশ্বর জীবনের ঝুঁকি নেবে? যদি বাঁচে অরুণাশ্ব, তার কাজে লাগতে পারে, তবে ওর ওই রোমথা দশা থেকে মুক্তি ও পাবেই। যদি বৃকোদর ঝুঁকি না নেয়, তা হলেও কি অরুণাশ্ব বাঁচবে? এবার হয়তো ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠবে, কিন্তু তারপর? আবার তো অরুণাশ্বর ওপর পরীক্ষা চালাবেন জীবদত্ত। সেবার বেঁচে গেলে আবার। তারপর আবার...

বৃকোদর মন শক্ত করল। এভাবে সারাজীবন মরা-বাঁচার সুতো ধরে ঝোলার থেকে একবারে মরে যাওয়া বোধ হয় ঢের ভাল। যাবে বৃকোদর, অরুণাশ্বর জন্য ওষধি আনতে যাবে। এক্ষুনি। এক্ষুনি। জঙ্গলের গভীরে। শবরদের কাছ থেকে।

দ্রুত পায়ে উত্তরে এগোল বৃকোদর। শিবমন্দির পেরিয়ে বনে ঢুকল, খানিকটা গিয়ে থামল এক অর্জুন গাছের নীচে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিল একবার। কোনও জনমনিষ্যি নেই দেখে ঝটিতি উঠে পড়ল গাছে। ডালে বেঁধে রাখা তার রনপা দুটোকে পেড়ে আনল।

হ্যাঁ, রনপা। ইয়া লম্বা লাঠি, ডগায় পা বসানোর খাঁজ। এই রনপায়ে চড়ে রাতবিরেতে সে যখন হাওয়ার আগে ছুটে যায়, তখন তাকেই ভূত ভেবে শিউরে শিউরে ওঠে মানুষজন। কাল রাতে রনপা পরা বৃকোদরকে দেখে চার দূতও কম ভয় পায়নি।

অদ্ভুত দক্ষতায় কাঠের পা দুটো পরে নিল বৃকোদর। দ্যাখ না দ্যাখ তালগাছের মতো লম্বা হয়ে গেল। তারপর নিঃশব্দে মিলিয়ে গেল জঙ্গলে। প্রায় বাতাসের মতো।

boiRboi.net

অরুণাশ্বর মাথা ঝিমঝিম করছিল। ঘোর লাগা চোখে দেখছে নিজের ঘরখানা। এত লোক কেন ঘরে? জীবদত্ত, সেঁজুতি, সেঁজুতির মা, বৃকোদর... আশ্চর্য, বিরোচনও! সেনাপতিমশাই

মালঞ্চ গ্রামে এলেন কোত্থেকে?

জীবদত্তর স্বর শুনতে খেল, "এখন কেমন বোধ করছ অরুণাশ্ব?"

অরুণাশ্ব চট করে জবাব দিতে পারল না। শরীরের রক্তকণিকারা হঠাৎ কেমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে, দাপাদাপি করছে শিরায় শিরায়। অথচ দেহে কোনও বল নেই। কেমন যেন কাঁপুনিও আসছে। হৃৎপিন্ড দ্রুত চলতে শুরু করল সহসা। এই বিচিত্র অনুভূতি কি ভাল, না খারাপ?

বিকেল পড়ে এসেছে। ঘরে তেমন আলো নেই। আবছায়াতে অরুণাশ্ব টের পেল বৃকোদর তার মুখের ওপর ঝুঁকেছে, "নিজে নিজে উঠে বসতে পারবে অরুণাশ্ব?"

অরুণাশ্ব বিড়বিড় করল, "পারব কি?"

"দ্যাখো না চেষ্টা করে।"

মেঝেতে হাতের চেটো চেপে বসতে পারল অরুণাশ্ব। ভোঁ ভোঁ করছে মাথা, তবু পারল।

"এবার দ্যাখো তো দাঁড়াতে পারো কি না।"

"পারব না।" অরুণাশ্ব কাতরভাবে বলল, "হাঁটু কাঁপছে।"

"চেষ্টা করো।"

হাতে ভর দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল অরুণাশ্ব। সোজা হচ্ছে ক্রমশ। পুরোপুরি উঠে দাঁড়ানোর আগেই টলে গেল মাথা। পাক খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল, ধরে নিলেন বিরোচন। দাঁড় করিয়ে দিলেন।

সেঁজুতি হাততালি দিয়ে উঠল, "এই তো রোমথাদাদা পেরেছে। ও বাবা, রোমথাদাদা ভাল হয়ে গেছে গো।"

শরীর নুয়ে পড়তে চাইছিল অরুণাশ্বর। তবু প্রাণপণে টানটান করছে নিজেকে। আশ্চর্য, তেমন কষ্ট আর হচ্ছে না তো! শুধু মাথায় কী যেন গুন্ গুন্ করছে অবিরাম। সঙ্গে একটা বমি বমি ভাব। না

pathagar.net

আর একটা কষ্টও আছে। চনচন করছে পেট।

জীবদত্ত বুঝি অরুণাশ্বর মনের কথাটা টের পেয়েছেন। জিজ্ঞেস করলেন, "খিদে পাচ্ছে?"

অরুণাশ্ব মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ"।

"তোমাকে এই মুহূর্তে বেশি কিছু খাবার দেওয়া যাবে না। পেটে রাখতে পারবে না। ঘি মেখে সামান্য পরিমাণ ভাত খেয়ে নাও। শুকনো ভাত।"

সঙ্গে সঙ্গে সেঁজুতির মা চলে গেছেন অন্দরমহলে, আহার নিয়ে এসেছেন।

আবার মাটিতে থেবড়ে বসেছে অরুণাশ্ব। একটা একটা করে দলা তুলছে মুখে। প্রতিটি গ্রাস পরম তৃপ্তির সঙ্গে চিবোচ্ছে। দেখে মনে হয়, এই ভাতটুকুর জন্যই যেন সে সারাটা জীবন প্রতীক্ষা করে ছিল।

খাওয়া শেষ হতেই অরুণাশ্ব বলল, "বড় তেষ্টা। জল..."

সেঁজুতি ছুট্টে জল আনতে যাচ্ছিল। জীবদত্ত বাধা দিলেন, "উহুঁ, এখনই জল নয়। বরং একটা লেবু নিয়ে এসো। লেবু চুষলে আর বমি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। একদণ্ড বাদে ও হরীতকী মেশানো জল খাবে।"

সুবোধ বালকের মতো লেবু চুষছে অরুণাশ্ব। মাথার ঝিমঝিম ভাব কমে যাচ্ছে।

বিরোচন বলে উঠলেন, "আপনি তো অসাধ্য সাধন করলেন বৈদ্যমশাই! সাপে কাটা রুগিকে সুস্থ করে ফেললেন!"

জীবদত্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা বিরোচনকে জানায়নি বৃকোদর। বলেছে, অরুণাশ্বকে সাপে কেটেছে, জীবদত্ত চিকিৎসা করেছেন।

জীবদত্তর মুখে শিশুর হাসি, সবই মা জন্তল দেবীর কৃপা। আমি

boiRboi.net

অর্কপ্রভ দত্তগুপ্ত
732
7 MAY

নিমিত্ত মাত্র। তা ছাড়া আমার মনে হয় অরুণাশ্বর মনের জোরও আমার ওষুধকে সাহায্য করেছে।

কথাটা খট করে অরুণাশ্বর কানে বাজল। সত্যিই কি মানুষের বেঁচে থাকার ইচ্ছে মৃত্যুকে হারিয়ে দিতে পারে?

দণ্ডখানেক সময় কেটে গেল। খানিক বিশ্রাম নিয়ে নিজে নিজেই উঠে দাঁড়াল অরুণাশ্ব। ধীর পায়ে পায়চারি করছে ঘরে। মাথাটা অদ্ভুত রকমের স্বচ্ছ হয়ে গেছে। শরীরে আর কোনও জড়তা নেই। ইন্দ্রিয়গুলোও যেন এখন বেশি প্রখর। প্রতিটি শব্দ গন্ধ বর্ণ সে যেন আরও গভীরভাবে অনুভব করতে পারছে।

ঘরের কোণে চাপা স্বরে কী যেন আলোচনা করছেন জীবদত্তরা, শুনতে পাচ্ছিল অরুণাশ্ব।

"কিন্তু তুমি অরুণাশ্বকে কোথায় নিয়ে যেতে চাও, তা তো বললে না বামুনঠাকুর?"

"বলার উপায় নেই কবিরাজমশাই। শুধু জেনে রাখুন, এ হল মহারাজা বল্লালসেনের কাজ।"

"আপনি কি তাঁর কাজে বাধা সৃষ্টি করতে চান বৈদ্যমশাই?"

"আরে না, না। মহারাজের পাঞ্জা দেখেই বুঝেছি, আমাদের বামুনঠাকুরটি যে-সে লোক নয়। তবু কৌতূহলবশে...। বোঝেনই তো, মহারাজা অরুণাশ্বর দায়িত্ব আমার ওপরই দিয়েছেন।"

"আমি তো আপনাকে কথা দিচ্ছি, অরুণাশ্বর কোনও অনিষ্ট হবে না।"

"ব্যস, খুশি তো? বামুনঠাকুরের কথা অমান্য করবেন না।"

অরুণাশ্ব ভীষণ অবাক হচ্ছিল। বিরোচন হঠাৎ বামুনঠাকুরের অনুচরের মতো কথা বলছেন কেন? বৃকোদর কী এমন কেউকেটা যে তার কাছে মহারাজা বল্লালসেনের পাঞ্জা থাকবে? তবে কি বামুনঠাকুর কোনও ছদ্মবেশী উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী? বিক্রমপুর

থেকে আসার পথে এরকম একটা ক্ষীণ সন্দেহ তার মনে উঁকি দিয়েছিল বটে। মনে হয়েছিল, মানুষটা নিজেকে যেভাবে দেখায়, তেমনটা বোধ হয় নয়! সন্দেহটা তা হলে সত্যি? কিন্তু এমন মানুষ তার সঙ্গেই বা কেন পাড়ি দিয়েছিল? কেনই বা জানতে চাইত তার বাবার মৃত্যুর খুঁটিনাটি তথ্য? আজই বা কোথায় নিয়ে যাবে তাকে? কোন গোপন কাজে?

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়। জীবদত্তর সঙ্গে আলাপ সেরে কোথায় যেন চলে গেল বামুনঠাকুর! সন্ধে গাঢ় হওয়ার আগে ফিরল দু-দু'খানা ঘোড়া নিয়ে! একটা ঘোড়ার পিঠে বিরোচন তড়াং করে উঠে বসলেন।

অন্য ঘোড়াটার পিঠ চাপড়ে বৃকোদর জিজ্ঞেস করল, "কী হে অরুণাশ্ব, ঘোড়ায় চড়তে পারো তো?"

অরুণাশ্বর গলা দিয়ে উত্তর ঠিকরে এল, "নিশ্চয়ই পারি। আমাদের তিন-তিনখানা ঘোড়া ছিল। রোহিত নামের ঘোড়াটাতে তো আমি একলাই চড়তাম।"

"অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে চালাতে পারবে?"

"পারব।"

সাদা ঘোড়াটার কেশরে হাত বোলাল অরুণাশ্ব। ঘোড়াও বুঝি স্নেহ টের পায়, অরুণাশ্বর গালে গাল ঘষছে। অনেককাল পর রোহিতের জন্য মন কেমন করে উঠল অরুণাশ্বর। আহা, সে বেচারি হয়তো এখনও তাকে খোঁজে।

অরুণাশ্ব জীবদত্তকে প্রণাম করল। সেঁজুতির মাকেও। তারপর এক লাফে ঘোড়ার পিঠে। লাগাম নিয়েছে হাতে। পাকা অশ্বারোহীর মতো।

বৃকোদর চাপা স্বরে বলল, "তোমার শরীর এখন দুর্বল। ঘোড়া এখন আমিই চালাচ্ছি। পথে যেতে যেতে যা বলব, মন দিয়ে

boiRboi.net

শোনো।"

দুলকি চালে রওনা হল ঘোড়া। অরুণাশ্ব ঘাড় ফিরিয়ে দেখল সেঁজুতি দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। বাবা-মার পাশে। সেঁজুতির কি চোখ ছলছল করছে? বোঝা যায় না।

অরুণাশ্বর বুকটা টনটন করে উঠল।—সেঁজুতির সঙ্গে একটাও কথা বলা হল না।

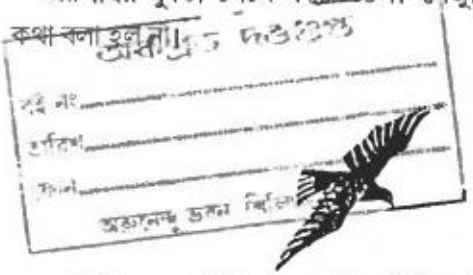

দুর্জয়সিংহের শিবিরের প্রহরী চেঁচিয়ে উঠল, "কে? কে ওখানে?"

জঙ্গলে শুকনো পাতা ভাঙার খড়মড় শব্দ। একটা হাউমাউ আওয়াজ উড়ে এল, "আজ্ঞে আমরা।"

"আমরা'টা কে?"

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে অন্ধকার ফুঁড়ে এক বাদামি ঘোড়ার আবির্ভাব। শিবিরের প্রান্তসীমায় এসে থামল ঘোড়া। পিঠে অরুণাশ্ব আর বৃকোদর।

অরুণাশ্ব যথাসম্ভব স্বর ভারী করে বলল, "আমি রাজা দেবকীর্তির কাছ থেকে আসছি। জরুরি বার্তা আছে।"

আরও ক'জন প্রহরী জড়ো হয়েছে। পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। প্রথম প্রহরী বলল, "এসো।"

শিবিরের এলাকায় ঢুকে অরুণাশ্ব ঘোড়া থেকে নামল। নামল বৃকোদরও। কিন্তু তার নামাকে গড়িয়ে পড়া বলাই ভাল। বৃকোদরকে দেখে প্রহরীর দল হেসে লুটোপুটি।

boiRboi.net

একজন প্রশ্ন ছুড়ল, "ইটি কে?"

"আজ্ঞে, আমি এক নিরীহ বামুন। পুজোআর্চা করে খাই। ইনি আমাকে ধরে এনেছেন।"

"চোপ। একটাও কথা নয়।" অরুণাশ্ব গর্জে উঠল। প্রহরীদের দিকে ফিরে আবার স্বর নরম, "রাজামশাইরা সব কোথায়? আমি এক্ষুনি তাঁদের দর্শন চাই।"

"রোসো, রোসো। সংবাদ পাঠাচ্ছি, ডাক পড়লে যাবে।"

খুঁটিতে ঘোড়া বাঁধতে বাঁধতে আশপাশের শিবিরগুলোতে চোখ বোলাল অরুণাশ্ব। আগুনে কাঠকুটো জ্বেলে রান্না হচ্ছে একধারে, ভেসে আসছে সুঘ্রাণ। বেশ কয়েকজন সৈনিক ঘোরাফেরা করছে এদিক-ওদিক, নিজেদের মনে হইহল্লা করছে। কত সৈন্য আছে এখানে? শ'খানেক? শ'দেড়েক? আশ্চর্য, তিন-তিনটে রাজা এসে শিবির গেড়েছে, জঙ্গলের বাইরে থেকে কিচ্ছুটি টের পাওয়ার উপায় নেই!

অরুণাশ্ব অবশ্য আর কোনও কিছুতেই অবাক হবে না। বৃকোদর আজ তাকে যা সব শুনিয়েছে, তারপর বুঝি আর নতুন করে বিস্ময় জাগেও না। বৃকোদর নাকি মহামন্ত্রী ত্রিবিক্রম শর্মার বিশেষ চর। দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায় সে। কখনও থাকে পাটলিপুত্রে, কখনও মগধে, কখনও বা কাশী কোশলে, কখনও বা কর্ণাট। কলিঙ্গ দেশেও নাকি সে ছিল কিছুদিন। তার কাজ মানুষের ভিড়ে মিশে থেকে মহামন্ত্রীর জন্য খবরাখবর সংগ্রহ করা। প্রয়োজনে বৃকোদর দেশ-বিদেশের রাজপুরুষদের সঙ্গেও ভাব জমায়, রাজা মন্ত্রীদের গতিবিধির নাড়িনক্ষত্র জেনে নেয়। বৃকোদরের অধীনেও নাকি কিছু চর আছে, তাদের মাধ্যমে মহামন্ত্রীর কাছে নিয়মিত খবর পাঠায় বৃকোদর। এই যে তিন রাজা লক্ষ্মণসেনের সঙ্গে যুদ্ধ করার ফন্দি এঁটেছেন, এই সংবাদও নাকি পৌঁছে গেছে কর্ণসুবর্ণে। এমনকী,

বিক্রমপুরেও। বৃকোদর নাকি চার-পাঁচটা ভাষায় অনর্গল কথা বলে যেতে পারে, পাখির ডাক নকল করতে পারে, গলার স্বরের ভেলকি জানে। অভিনয়ে পটু, আবার তলোয়ারেও। এমন গুণধর পাশে আছে জানলে ভিতু লোকেরও বলভরসা কত বেড়ে যায়।

অরুণাশ্ব অবশ্য ভিতু নয়। মৃত্যুকে সে ভীষণ কাছ থেকে দেখেছে, ভয় শব্দটা এখন আর তার অভিধানে নেই। পথে বৃকোদর পাখিপড়ার মতো তাকে শিখিয়ে দিয়েছে কী কী করতে হবে এখন। বিরোচন নিশ্চয়ই এতক্ষণে পৌঁছে গেছেন যথাস্থানে, অপেক্ষা করছেন অরুণাশ্বদের জন্য। এবার শুরু হবে অরুণাশ্বর চরম পরীক্ষা।

মাথার পাগড়িটা খুলে আবার ভাল করে বেঁধে নিল অরুণাশ্ব, যাতে কপালের দাগ একদম না দেখা যায়। তারপর প্রহরীর হাঁক শুনে গুটিগুটি পায়ে বড় শিবিরটায় ঢুকল। পেছনে বৃকোদর, লেজুড় হয়ে।

তিন রাজা বসে আছেন তিন আরামকেদারায়। হাতে পানপাত্র, চোখ ঢুলুঢুলু। বৃকোদর নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে দিয়েছে, কে কোনজন চিনতে অরুণাশ্বর একটুও অসুবিধে হল না।

আভূমি নত হয়ে রাজাদের অভিবাদন জানাল অরুণাশ্ব। দেখাদেখি বৃকোদরও। সে মাথা নামিয়েছে তো নামিয়েইছে, ওঠানোর নামটি নেই।

দুর্জয়সিংহ মন্দ্র স্বরে প্রশ্ন করলেন, "আবার কী সংবাদ পাঠালেন রাজা দেবকীর্তি?"

"রাজামশাইয়ের ঘোরতর সর্বনাশ হয়ে গেছে।" অরুণাশ্বর গলা কাঁপা কাঁপা, "দণ্ডভুক্তি থেকে সরে যেতে হয়েছে তাঁকে।"

"সে কী? কেন?" রাজারা টানটান।

"আজ খুব ভোরে লক্ষ্মণসেনের সৈন্যরা হঠাৎ দণ্ডভুক্তিতে হানা

boiRboi.net

দেয়। রাজা দেবকীর্তি আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না, তবু তাঁর অল্প সৈন্য নিয়ে যথাসাধ্য লড়াই চালিয়েছিলেন। তবে অসীম বীরত্ব দেখিয়েও তিনি যুদ্ধ জিততে পারেননি। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে পালাতে হয়েছে।"

বিক্রমসিংহার্জুনদেব টলমল পায়ে উঠে দাঁড়ালেন, "তিনি এখন কোথায়?"

"এই জঙ্গলেই। ক্রোশদুয়েক দক্ষিণে। আমি সেখান থেকেই আসছি।"

"এ কী কথা!" দুর্জয়সিংহ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, "তিনি এখানে এলেন না কেন?"

"তাঁর আর সে ক্ষমতা নেই মহারাজ।" অরুণাশ্ব কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলল, "তিনি এখন অন্তিম শয্যায়।"

বৃকোদর ফুট কাটল, "রক্তে একেবারে ন্যাতাজোবড়া হয়ে পড়ে আছেন।"

তিনজোড়া চোখ একসঙ্গে বৃকোদরের দিকে গেল। কপিলদেব কটমট তাকালেন অরুণাশ্বর দিকে, "একে পেলে কোত্থেকে?"

"আজ্ঞে মহারাজ...'" অরুণাশ্ব ঢোক গিলল, "রাজা দেবকীর্তি যেখানে আশ্রয় নিয়েছেন, তার নিকটেই ওঁর সঙ্গে দেখা। আমি এ জঙ্গল কিছুই চিনি না। রাজা দেবকীর্তির যে দূত আপনাদের কাছে এসেছিল, সেও আজ যুদ্ধে...। তাই এই বামুনটাকে নিয়ে...। ও বলল, ও নাকি আপনাদের শিবির চেনে।"

"চিনি বলিনি মহারাজ। বলেছি, সৈন্যদের শিবির আমি দেখেছি।" বৃকোদর কাঁদো কাঁদো গলায় বলে উঠল, "জঙ্গলের মধ্যে মা-চণ্ডীর একটা থান আছে, প্রতি মঙ্গলবার সেখানে আমি মায়ের পুজো করতে আসি। আজও সেদিকেই যাচ্ছিলাম, তখনই আপনাদের লোকলশকর চোখে পড়ে। সেটাই মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে

গিয়েছিল, তাই লোকটা আমায় ধরে এনেছে।" বলেই বৃকোদর কাকুতি মিনতি শুরু করল, "ও রাজামশাইরা, এবার আমায় ছেড়ে দিন গো। আর কোনওদিন আমি এ-মুখো হব না গো।"

কপিলদেব হা হা হেসে উঠলেন, "ওরে কে আছিস? এই বামুনটাকে ভাগিয়ে দে।"

বৃকোদর দারুণ খুশি হয়ে চলে যাচ্ছিল, অরুণাশ্ব খপ করে তার হাত চেপে ধরল, "দাঁড়াও, দাঁড়াও।"

বৃকোদর ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিল, "রাজামশাইরা আমায় ছেড়ে দিয়েছেন, তুমি আটকে রাখার কে হে?"

"বোঝাচ্ছি তোমার মজা।" অরুণাশ্ব ত্বরিত পায়ে দুর্জয়সিংহের কাছে গেল। চাপা স্বরে বলল, "মহারাজ, একে ছেড়ে দিলে কিন্তু অনর্থ হতে পারে।"

"কেন?"

"লোকটা যদি গাঁয়ে ফিরে রটিয়ে দেয় আপনারা এখানে আছেন, তা হলে আর খবরটা লক্ষ্মণসেনের কাছে পৌঁছতে কতক্ষণ! আশপাশের গাঁয়ে কি লক্ষ্মণসেনের চর নেই?"

"তাই তো। ঠিকই তো।" দুর্জয়সিংহ তেড়ে উঠলেন, "অ্যাই বামুন, তুমি কোথাও যাবে না। একচুল যদি নড়ো, আমাদের কিন্তু ব্রহ্মহত্যা করতে হবে।"

ধপ করে মাটিতে বসে পড়ল বৃকোদর।

অরুণাশ্বর মুখে নিশ্চিন্ত ভাব ফিরে এল। গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, "যে উদ্দেশ্যে এসেছিলাম এবার তা হলে তা নিবেদন করি? রাজা দেবকীর্তি অন্তিম ক্ষণে অন্তত একটিবার আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে চান।"

"কেন?"

অতি নিচু গলায়, যেন বৃকোদরের কান বাঁচিয়ে বলছে, এমন

boiRboi.net

ভঙ্গিতে অরুণাশ্ব বলল, "কর্ণসুবর্ণের দুর্গের বাইরে দুটো গুপ্ত পথ আছে। সেই পথ ধরে একেবারে প্রাসাদের অন্দরমহলে পৌঁছে যাওয়া যায়। লক্ষ্মণসেনের বিরুদ্ধে অতর্কিত আক্রমণ শানাতে গেলে ওই দুই গুপ্ত পথের হদিস জানা অবশ্য প্রয়োজন। রাজা দেবকীর্তি ওই পথ দুটির কথা আপনাদের জানিয়ে দিতে চান। তাঁর ইচ্ছা, তিনি মরে যান ক্ষতি নেই, সেনরাজারা কর্ণসুবর্ণ থেকে বিতাড়িত হলেই তাঁর আত্মা তৃপ্ত হবে।"

শিবির কয়েক পল নিশ্চুপ, দীপাধারের বাতির আলোয় জ্বলছে নিভছে রাজাদের চোখ। বিক্রমসিংহার্জুনদেব চোখ রগড়ালেন। কপিলদেবের নিশ্বাস বন্ধ। দুর্জয়সিংহ চিন্তান্বিত।

খানিক পরে দুর্জয় সিংহ প্রথম কথা বললেন, "হুম, ভাল প্রস্তাব।... তা রাজা দেবকীর্তির কি বাঁচার সম্ভাবনাই নেই?"

"খুব কম। তাঁর জানুতে আর কাঁধে গভীর ক্ষত। রক্তপাতে ভয়ানক কাহিল হয়ে গেছেন। এক সৈনিক আছে তাঁর কাছে, লতাপাতা লাগিয়ে শুশ্রূষার চেষ্টা করছে। মহারাজ, আপনারা সত্বর না গেলে হয়তো তিনি আর...।" নিপুণ অভিনেতার মতো চোখ মুছল অরুণাশ্ব।

"তা হলে তো এখনই বেরোতে হয়। আমার সৈন্যদের প্রস্তুত হয়ে নিতে বলি।"

"মহারাজ।" অরুণাশ্ব ঢোক গিলল, "রাজা দেবকীর্তি শুধু আপনাদের তিনজনের সঙ্গেই দেখা করতে চান।"

"মানে? যা সৈন্য আছে, নিয়ে যাব না?"

"ওঁর তাই ইচ্ছে।"

"তা কী করে হয়? জঙ্গলের ভেতরে...এই অন্ধকারে..." বিক্রমসিংহার্জুন সন্দিগ্ধ চোখে তাকালেন, "দেবকীর্তির এমন ইচ্ছের কারণ?"

boiRboi.net

"তিনি বড় হীন দশায় রয়েছেন মহারাজ। অন্য রাজার সৈন্যরা তাঁকে ওই দশায় দেখলে তিনি মরেও শান্তি পাবেন না।"

রাজারা তবু ইতস্তত করছেন। তীক্ষ্ণ চোখে পড়ে নিতে চাইছেন অরুণাশ্বর মনোভাব।

অরুণাশ্বর অস্বস্তি হচ্ছিল। ভিক্ষু সুভদ্র তাকে কপট আচরণ করতে নিষেধ করেছিলেন। সে আজ যা করছে তাকে কী বলে? উঁহুঁ, সে তো নিজের জন্য কিছু করছে না। সে মহারাজা বল্লাল সেনের প্রজা। মহারাজার সেবা করা তার কর্তব্য। তা ছাড়া যুদ্ধে কি অন্যায় বলে কিছু আছে? যদি কোনও পাপ হয়ও, তা নিশ্চয়ই তাকে স্পর্শ করবে না।

বুক ভরে শ্বাস টানল অরুণাশ্ব, "তাড়াতাড়ি চলুন রাজামশাই। আপনারা নিশ্চয়ই...."

অরুণাশ্ব থেমে গেল।

অমনই বৃকোদর পুট করে বলে উঠল, "চুপ করে গেলে কেন? বলো, কী বলতে চাইছ।" বলতে বলতে পটাং করে উঠে দাঁড়াল, "রাজামশাইরা যদি অভয় দেন তো বলি। রাজা দেবকীর্তির কথা আমি স্বকর্ণে শুনেছি।"

"কী বলেছেন রাজা দেবকীর্তি?"

"এই দূতটা খুব ইনিয়ে বিনিয়ে বলছিল, ওঁরা, মানে আপনারা কি সৈন্য-সামন্ত ছাড়া আসতে চাইবেন! তখন ওই রাজামশাইটা বললেন, দ্যাখো হে বাপু, রাজামশাইরা কখনও তোমাদের মতো কাপুরুষ হন না। তাঁরা একাই এক-একটা সৈন্যদলের সমান। জঙ্গলের অন্ধকার, ভূতপ্রেত, জন্তুজানোয়ার, কোনও কিছুই তাঁদের আটকে রাখতে পারে না। আর তাঁরা যদি সত্যি ভয় পান, তা হলে বুঝবে তাঁরা রাজা হওয়ার যোগ্য নন।"

বিক্রমসিংহ সঙ্গে সঙ্গে কোষ থেকে তলোয়ার বার করেছেন,

"এ কথা বলেছেন নাকি দেবকীর্তি?"

"তবে আর কী বলছি! ও ব্যাটা কথাটা চেপে যাচ্ছিল।" ক্রোধে অপমানে গরগর করছেন তিন রাজা। শিবিরের কোণে গিয়ে কী যেন গুজগুজ ফুসফুস হল। কর্ণসুবর্ণের গুপ্ত পথের সন্ধান জেনে নিয়েই দেবকীর্তিকে নিকেশ করার মতলব ভাঁজছেন কি?

ফেরা না পর্যন্ত সৈন্যদের শিবিরে অনড় থাকার নির্দেশ দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তিন রাজা। ঘোড়ায় চড়ে। সামনে সামনে চলল বৃকোদর অরুণাশ্ব। হাতে তাদের জ্বলন্ত মশাল। মিশকালো অন্ধকারে ঘোড়ার পায়ের শব্দ বাজছে খটাখট।

বিক্রমসিংহার্জুনদেব বললেন, "দুম করে বেরিয়ে পড়াটা কি ঠিক হল? আজ রাতেই না আপনাদের সৈন্য সামন্তদের পৌঁছে যাওয়ার কথা?"

"আসুক না, কী আছে!" কপিলদেব অলস গলায় বললেন, "তারা অপেক্ষা করবে।"

দুর্জয় সিংহ বললেন, "আমরা নিশ্চয়ই ভোরের আগেই ফিরে আসব। আমাদের যুদ্ধযাত্রা তো সেই কাল রাতে।"

শিবির থেকে দক্ষিণে বেরিয়ে ক্রমে ক্রমে পশ্চিমে সরে যাচ্ছে অরুণাশ্বরা। পথের অভিমুখ যে বদলে যাচ্ছে, বৃকোদরের নিপুণ অশ্ব চালনায় তা বোঝার উপায় নেই।

দণ্ডতিনেক পর নির্দিষ্ট স্থানে এসে পৌঁছল সকলে। খানিক দূরেই বিরোচন দাঁড়িয়ে। আলো দেখেই দৌড়ে এসেছেন তিনি।

রাজাদের শোনাতে ইচ্ছে করে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল অরুণাশ্ব, "এখন কেমন আছেন রাজামশাই?"

"ভাল না।" তোতা পাখির মতো শেখানো বুলি আওড়ালেন বিরোচন, "আপনারা এক্ষুনি আসুন।"

"কোথায়? কদ্দূর?" দুর্জয় সিংহ প্রশ্ন করলেন।

boiRboi.net

"ওই যে, ওই মশাল দেখা যাচ্ছে.....।"

সত্যি সত্যি এক ক্ষীণ আলো দেখা যায় অল্প দূরে। অরুণাশ্ব বলল, "আপনারা এগিয়ে যান। রাজামশাই শুধু আপনাদের সঙ্গেই কথা বলবেন।"

"হ্যাঁ, ওখানে এখন আর কেউ নেই।"

তিন রাজার ঘোড়া বিশ পা'ও এগোল না। ঝপাং ঝপাং করে পড়ছে হাতি ধরার গর্তে। দুর্জয় সিংহ শেষ মুহূর্তে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ার চেষ্টা করলেন, তার আগেই ঘোড়া তাঁকে নিয়ে ডুবে গেছে খাদে।

ঘোড়ার চিঁহি ডাকে আর তিন রাজার গর্জনে কান পাতা দায়। ধীরে ধীরে স্বরগুলো মিইয়ে এল।

বৃকোদর হুঙ্কার ছুড়ল, "বেশি ছটফট করবেন না আপনারা। নিজের চেষ্টায় সারা জীবনেও আপনারা ওই ফাঁদ থেকে বেরোতে পারবেন না। যদি বেশি চেঁচামেচি করেন, আমার লোকরা আপনাদের হত্যা করতে বাধ্য হবে।"

বিরোচন সম্ভ্রমের সঙ্গে বৃকোদরকে প্রশ্ন করল, "এবার আমার কী কর্তব্য, বামুনঠাকুর?"

"এই গর্তর চারপাশে টহল দিন। আর অরুণাশ্ব, তুমি উঠে যাও গাছের ওপরে। নজর রাখবে, কোনওদিক থেকে কোনও সৈন্য এদিকে আসছে কি না। যদি দ্যাখো, সঙ্গে সঙ্গে বিরোচনকে ইশারা করবে। বিরোচনের তখন কাজ হবে কজঙ্গলের সৈন্য সেজে সেইসব সৈন্যদের ভুলিয়ে ভালিয়ে অন্যপথে নিয়ে যাওয়া।"

"নিশ্চয়ই পারব।" বিরোচন গোঁফ চুমরোলেন, "আমার কথা শুধু একটু মনে রাখবেন বামুনঠাকুর। মহারাজকে বলবেন বিরোচন কীরকম সাহস দেখিয়েছে।"

"সে হবে'খন। এখন আমি চলি।" অরুণাশ্বর পিঠ চাপড়ে দিল

বৃকোদর, "কাল দুপুরের মধ্যেই আমি যুবরাজকে নিয়ে কর্ণসুবর্ণ থেকে ফিরব। ততক্ষণ পর্যন্ত এই চার বিদ্রোহী রাজার দায়িত্ব কিন্তু তোমাদের।"

বৃকোদর অন্ধকারেই হাঁটা দিল, মশাল হাতে।

অরুণাশ্ব পেছন থেকে ডাকল, "ঘোড়া নিলেন না বামুনঠাকুর?"

বৃকোদর হাসল, "ঘোড়া আমার লাগে না। ঘোড়ার চেয়েও বেগবান বাহন আছে আমার। দরকার হলে এক রাতে আমি বিশ যোজন পথ অতিক্রম করতে পারি।"

অরুণাশ্ব বিস্মিত মুখে বলল, "কী বাহন সেটি?"

"তোমাকে দেখাব।" বৃকোদরের হাসি চওড়া হল, "মালঞ্চ গ্রামের সবাই ভূত দেখে, আমিই সেই ভূত। আমি বাতাসের চেয়েও জোরে ছুটি।"

জ্বলন্ত মশাল হাতে বৃকোদর অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে বসে আছে অরুণাশ্ব আর বিরোচন। সামনের গর্তে আস্ত তিনটে রাজা! উহ্ আহ্ করছে।

boiRboi.net

গাছের ডালে বসেও ভোরের মুখে চোখ দুটো জড়িয়ে এসেছিল অরুণাশ্বর। মৃদু এক শব্দে ঘোর কেটে গেল। বিস্ফারিত চোখে দেখল হাতি-ধরা ফাঁদের গা বেয়ে উঠে আসছেন একজন। লতাপাতা আঁকড়ে ধরে। রাজা দুর্জয়সিংহ না? সর্বনাশ, বিরোচন গেলেন কোথায়?

ভূমিতলে উঠেই খাপ থেকে তলোয়ার বার করলেন দুর্জয়

সিংহ। এদিক-ওদিক দেখছেন। অরুণাশ্ব পাতার আড়ালে মুখ লুকোল। না, ওপরপানে রাজার চোখ নেই। তাঁর দৃষ্টি গাছের গুঁড়ির দিকে স্থির। সন্তর্পণে এক পা এক পা করে এগোচ্ছেন।

তখনই অরুণাশ্বর রক্ত হিম হয়ে গেল। কী কাণ্ড, গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন বিরোচন!

এখন কী করে অরুণাশ্ব? মরিয়া হয়ে ডাকবে সেনাপতিমশাইকে? না কি একা লড়বে দুর্জয়সিংহের সঙ্গে? পারবে কি? কাল রাতে শরীরটা বেশ তাজা হয়েছিল, এখন আবার ক্লান্তিতে ছেয়ে গেছে। বড় দুর্বল লাগছে নিজেকে। এই অবস্থায় কি ওই তাগড়াই রাজার সঙ্গে লড়াই সম্ভব?

অরুণাশ্ব বেশি ভাবনার অবকাশ পেল না। গাছের গোড়ায় পৌঁছে গেছেন দুর্জয়সিংহ, বিরোচনকে কোপ মারতে যাচ্ছেন। শিকারি চিতার মতো ঝাঁপ দিল অরুণাশ্ব। একেবারে দুর্জয় সিংহের ঘাড়ের ওপর। চকিত আক্রমণে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেছেন রাজা। আবার দাঁড়ালেন।

ঝটাপটির আওয়াজে বিরোচনের ঘুম ভেঙেছে। ভীষণ ঘাবড়ে গেছেন তিনি, কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। অরুণাশ্বর হাত খালি, সেও আর রাজার দিকে এগোতে ইতস্তত করছে।

মুহূর্তের অবকাশে দুর্জয়সিংহ দে ছুট। হঠাৎ অরুণাশ্বর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। পলকে ভেঙে নিয়েছে গাছের এক শুকনো ডাল। ক'পা দৌড়ে সজোরে ছুড়ল ডালটাকে। নিখুঁত নিশানা। দুর্জয়সিংহের পায়ে আছড়ে পড়ল শক্ত ডাল, মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন তিনি। বিদ্যুদ্বেগে ছুটে গিয়ে রাজার পিঠে চেপে বসল অরুণাশ্ব। প্রাণপণ শক্তিতে মাটিতে ঠেসে ধরল দুর্জয়সিংহের মুখ। হাত পা ছুড়ছেন দুর্জয়সিংহ, ছিটকে ফেলে দিতে চাইছেন অরুণাশ্বকে। দেহের সমস্ত শক্তি সংযত করে তাঁর কাঁধে আঘাত

হানল অরুণাশ্ব। একবার, দু'বার, বারবার।

বিরোচনের সংবিৎ ফিরেছে। ছুটে এসেছেন অরুণাশ্বকে সাহায্য করতে। পা দিয়ে চেপে ধরলেন দুর্জয়সিংহের তলোয়ার। গর্জন করে উঠলেন, "আর এক পা'ও নড়ার চেষ্টা করবেন না। না হলে কিন্তু..."

দুর্জয়সিংহের প্রতিরোধ ক্ষীণ হয়ে এল।

বিরোচন বাঁধাবাঁধির কাজে খুব দড়। হাতের কাছে দড়িদড়া নেই, মাথার পাগড়ি খুলে দিল অরুণাশ্ব, তাই দিয়ে কষে দুর্জয় সিংহকে বেঁধে ফেললেন বিরোচন। হেনে হিঁচড়ে দু'জনে মিলে রাজাকে গাছের গোড়ায় এনে বসালেন।

অরুণাশ্ব টুক করে গর্তে উঁকি দিয়ে এল। বাকি দুই রাজা ছটফট করছেন খাদে, বারবার ওপরদিকে তাকাচ্ছেন। বোধ হয় দুর্জয় সিংহ তাঁদের এবার সাহায্য করবেন এই আশায়।

ক্ষোভে, হতাশায় দুর্জয়সিংহের মুখ ঘন কালো । তলোয়ার উঁচিয়ে বিরোচন তাঁকে পাহারা দিচ্ছেন।

অসহায় তিন মহাসামন্তকে দেখে অরুণাশ্বর খারাপ লাগছিল। কেন যে মানুষ যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারে না! কেন যে মানুষের এত আকাঙ্ক্ষা!

আর কোনও অঘটন ঘটল না।

সূর্য মাঝ গগনে পৌঁছনোর আগেই জঙ্গল ছেয়ে গেল সৈন্যে। যুবরাজ লক্ষ্মণসেনের একদল সৈন্য চলে গেল তিন মহাসামন্তের শিবির দখল করতে, অন্য দল এসে গহ্বর থেকে তুলল মহাসামন্তদের। ঘোড়া তিনটেকেও তোলা হল। ইয়া বড় বড় গাছের গুঁড়ি ফেলে।

সৈন্যদলের পেছন পেছন এসে পড়লেন লক্ষ্মণসেন। বৃকোদরও রয়েছে তাঁর পাশে। সে চড়েছে এক সাদা ঘোড়ায়, তার পরনে

boiRboi.net

এখন রাজপুরুষের পোশাক।

তিন বন্দি মহাসামন্তকে সঙ্গে নিয়ে তাঁদেরই শিবিরের দিকে চলল সকলে। লক্ষ্মণসেনের সৈন্যরা আগেই শিবির দখল করে নিয়েছিল, সেখানেই তখনকার মতো আস্তানা গাড়লেন লক্ষ্মণ সেন।

দণ্ড কয়েক বিশ্রামের পর তিন মহাসামন্তকে যুবরাজের সামনে আনা হল। তিনজনেরই মুখ অবনত, শৃঙ্খলিত দশা, দেখেই বোঝা যায় তাঁরা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত।

যুবরাজ লক্ষ্মণসেন প্রশ্ন করলেন, "আপনারা কি আপনাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত?"

তিনজনই চুপ।

লক্ষ্মণসেন এক মুহূর্ত নীরব থেকে বললেন, "বিদ্রোহী রাজা বা সামন্তদের হত্যা করা মহারাজা বল্লালসেনের নীতি নয়। আবার মহারাজা বল্লালসেন এমন ক্ষমাশীলও নন যে, আপনাদের বিনা সাজায় মুক্তি দেবেন। আপনারাই বলুন, আপনাদের কী দণ্ড হওয়া উচিত? আজীবন কারাবাস? অঙ্গচ্ছেদ?"

এবারও তিন মহাসামন্ত নীরব। তবে তাঁদের মুখে ভয়ের ছায়া স্পষ্ট। লক্ষ্মণসেনের সুঠাম দেহটি নড়েচড়ে উঠল। জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, "শুনুন, পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত অরিরাজ-নিঃশঙ্ক-শঙ্কর বল্লালসেনের প্রতিনিধিরূপে আমি আপনাদের দণ্ড ঘোষণা করছি। তিন মহাসামন্তই এক পক্ষকালের মধ্যে মহারাজের কোষাগারে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা জমা করবেন। এ ছাড়া চম্পার মহাসামন্ত দুর্জয়সিংহ পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী পাঠাবেন কর্ণসুবর্ণে। তারা আমার অধীনে থেকে গৌড় যাত্রা করবে। অপরমন্দারের সামন্ত কপিলদেব পাঠাবেন তিন সহস্র পদাতিক। কজঙ্গলের বিক্রমসিংহার্জুন পাঠাবেন পাঁচশত হাতি। গৌড়ের সঙ্গে

যুদ্ধে এদের আমার প্রয়োজন। আপনারা এই শাস্তি মেনে নিচ্ছেন?"

"নিচ্ছি।" বিক্রমসিংহার্জুন তড়িঘড়ি বলে উঠলেন, "তা হলে আমাকে ছেড়ে দিন, আমি গিয়ে হাতির ব্যবস্থা করি।"

লক্ষ্মণসেন সহাস্যে বললেন, "তা কি হয় বিক্রমসিংহার্জুনদেব? নিজেদের জায়গায় ফিরে আপনারা আবার কী মূর্তি ধরবেন তার ঠিক কী? আপনারা এখনই পত্র লিখে দিন, আমার দূত সেই পত্র নিয়ে আপনাদের রাজ্যে যাবে। সব কিছু শান্তিমতো কর্ণসুবর্ণে এসে পৌঁছনো পর্যন্ত আপনাদের দয়া করে আমার আতিথ্য গ্রহণ করতে হবে। আপনাদের এক্ষুনি চোখের আড়াল করতে আমার মন চাইছে না।"

মানা ছাড়া উপায় কী! মাথা নিচু করে কড়া পাহারায় পাশের শিবিরে চলে গেলেন তিন মহাসামন্ত।

এবারে অরুণাশ্ব আর বিরোচনের ডাক পড়ল।

বিরোচনের মুখে কাল রাত থেকে আজ সৈন্যদল না পৌঁছনো পর্যন্ত কী কী ঘটেছে তার বিবরণ শুনলেন লক্ষ্মণসেন। আশ্চর্য, এই প্রথম বিরোচন নিজের বীরত্বের বড়াই করলেন না! অরুণাশ্বই যে তাঁর প্রাণ বাঁচিয়েছে, এবং দুর্জয়সিংহকে পরাস্ত করেছে, এ-কথা স্বীকার করতে এতটুকু দ্বিধা হল না তাঁর। তবে দুর্জয়সিংহকে বেঁধে ফেলায় তাঁরও যে কিছু ভূমিকা ছিল, সেটা কথা প্রসঙ্গে বলেই ফেললেন।

লক্ষ্মণসেনের আজ খুশির মেজাজ। বললেন, "আপনি কী চান?"

বিরোচন হাত কচলালেন, "আজ্ঞে, যুবরাজ, আমি দীর্ঘ দশ বছর ধরে গণস্থ আছি। সেই মহারাজ বিজয়সেনের আমল থেকে। আমার কোনও উন্নতি নেই।"

"আপনি এখানে হাতি সংগ্রহ করতে এসেছিলেন না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, যুবরাজ।"

"হস্তিচালনা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে?"

"যথেষ্ট। আমি পূর্বতন মহারাজের হস্তিবাহিনীতেই প্রথম যোগদান করেছিলাম। হরিকেলে আমি হাতির পিঠে চড়েই যুদ্ধ করেছি।"

"বাহ, বাহ। গৌড় আক্রমণে আপনিই তবে হবেন আমার মহাপিলুপতি।"

বিরোচন আনন্দে প্রায় মাটিতে মিশে গেলেন, "যথা আজ্ঞা যুবরাজ। এই দীন সেবক আপনার জন্য জীবন দিয়ে দেবে, তবু কখনও রণক্ষেত্র ছাড়বে না।"

"উত্তম।"

খুশিতে ডগমগ বিরোচন চলে গেলেন।

এইবার অরুণাশ্বর পালা। লক্ষ্মণসেন জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কী চাও?"

অরুণাশ্ব জ্বলজ্বল চোখে যুবরাজের দিকে তাকাল।

"বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে?" লক্ষ্মণসেন হাসি-হাসি মুখে অরুণাশ্বকে বললেন, "তোমার বীরত্বের কথা আমি সব শুনেছি। তুমি না থাকলে বৃকোদরের এতসব পরিকল্পনা হয়তো ভেস্তে যেত। মহাসামন্তদের হয়তো আমি হাতেনাতে ধরতে পারতাম না। তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নেই।" বলতে বলতে অরুণাশ্বর কাছে এগিয়ে এলেন লক্ষ্মণসেন। গলা থেকে একটা রত্নখচিত হার খুলে অরুণাশ্বর দিকে বাড়িয়ে দিলেন, "এই সাতনরী হার আমি কাঞ্চীপুরম থেকে আনিয়েছিলাম। আজ এই হার আমি তোমায় দিলাম।"

বৃকোদর সামনেই ছিল। হঠাৎ হাঁ হাঁ করে ছুটে এল সে, "করছেন কী যুবরাজ? ওকে আপনি পুরস্কার দিতে যাচ্ছেন কেন?"

pathagar.net

লক্ষ্মণসেন হকচকিয়ে গেছেন, "দেব না! ও এতবড় কাজ করল! নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বিদ্রোহীদের শিবিরে গিয়েছিল..... ও তোমার মতো রাজকর্মচারীও নয়....."

"তো কী আছে? ওর আবার প্রাণের মূল্য কী?"

"কী বলছ তুমি বৃকোদর? একটা মানুষের প্রাণের মূল্য নেই?"

"না, নেই। ওর পূর্ব ইতিহাস আপনি জানেন যুবরাজ?"

"পূর্ব ইতিহাস?" লক্ষ্মণসেন বিস্মিত চোখে তাকালেন।

"যুবরাজ, আপনি হয়তো শুনেছেন, সম্প্রতি সুবর্ণগ্রামের এক বণিকপুত্র পিতৃহত্যার দায়ে প্রাণদণ্ডের আদেশ পেয়েছিল। পরে মহারাজা বল্লালসেন তাকে এক বৈদ্যের হাতে তুলে দেন। ওষুধ বিষুধ নিয়ে পরীক্ষা করার জন্য তার প্রাণ উৎসর্গ করা হয়েছে। এই ছেলেটিই সেই বণিকপুত্র।"

লক্ষ্মণসেন অস্ফুটে বললেন, "মানে..... রোমথা?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ যুবরাজ। রোমথা। দেখুন না, ওর কপালে দেগে দেওয়া আছে।" বৃকোদর গর্বিত মোরগের মতো ঘাড় ফোলাল, "ওর প্রাণের কোনও মূল্য নেই বলেই আমি ওকে কবিরাজ জীবদত্তের কাছ থেকে নিয়ে গিয়েছিলাম। মরে গেলে মরে যেত, মহারাজা বল্লালসেনের জন্য মরত। ওকে মিছিমিছি অত দামি একটা হার পুরস্কার দেওয়ার মানে হয় না। সারাজীবন ও তো ওই কবিরাজ মশাইয়ের কাছে থাকবে। কবে মরে যাবে, কবে বেঁচে থাকবে ঠিক নেই, এ হার ওর কী কাজে লাগবে! আপনি ওর সঙ্গে হাসিমুখে দুটো কথা বললেন, বীরত্বের প্রশংসা করলেন, এই না ওর যথেষ্ট।"

"হুঁ, তাও বটে। তাও তো বটে।" লক্ষ্মণসেন মাথা দোলালেন। তাঁর লম্বা বাবরি চুল দুলে দুলে উঠল, কাছে এসে গভীর চোখে নিরীক্ষণ করলেন উল্কিটা। তারপর বললেন, "কিন্তু কিছু দেব

না?"

"প্রয়োজন নেই যুবরাজ। ও এখন মানে মানে কবিরাজমশাইয়ের কাছে ফিরে যাক।"

অরুণাশ্ব পাথর হয়ে বৃকোদরের কথা শুনছিল। বামুনঠাকুর তার সঙ্গে এতদিন ধরে কী ঘনিষ্ঠ ভাবেই না মিশেছে! কত মনের প্রাণের কথা হয়েছে দু'জনের! বামুনঠাকুর মোটেই বোকা লোক নয়, নিশ্চয়ই বুঝেছে অরুণাশ্ব বাবার হত্যাকারী হতেই পারে না। আজ সেই মানুষটা যুবরাজের সামনে একদম ভোল পালটে ফেলল? বামুনঠাকুরের ছদ্মবেশ ঝেড়ে ফেলে রাজকর্মচারী হয়ে সব দয়া মায়া উবে গেল? রাজকর্মচারী হলে কি নির্দয় হতে হয়?"

তাকে শুধু নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করল বামুনঠাকুর?

নতমস্তকে শিবির থেকে বেরিয়ে এল অরুণাশ্ব। জয়ের আনন্দ, বীরত্বের রোমাঞ্চ কোনও কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। এখন শুধু ক্লান্ত পা টেনে টেনে মালঞ্চ গ্রামে ফেরা।

কেন সাপের বিষেই মরে গেল না সে?

চেনা লোক হঠাৎ অচেনা হয়ে গেলে যে কী কষ্ট হয়!

মালঞ্চে ফিরতে সন্ধে গড়িয়ে গেল।

জীবদত্ত উদ্বিগ্ন মুখে ঘরবার করছিলেন। অরুণাশ্বকে দেখে ছুটে এসে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সেঁজুতি আনন্দে লাফাচ্ছে। সেঁজুতির মারও চোখে চিকচিক করছে জল। যেন অরুণাশ্ব দাস নয়, রোমথা নয়। যেন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এল।

boiRboi.net

অরুণাশ্বর ফেরার সংবাদ গ্রামেও রাষ্ট্র হয়ে গেছে। সকালেই গ্রামবাসীরা মালঞ্চের ওপর দিয়ে সৈন্যদলের ছোটাছুটি করা দেখেছে। তিন-তিনখানা রাজা ধরা পড়ার গল্পও তাদের আর অজানা নয়। বরং একটু বেশিই জানে তারা। সব ঘটনাই ফুলেফেঁপে পল্লবিত হয়েছে তাদের কানে। তাদের গ্রামের ছেলে

অরুণাশ্ব নাকি একাই তিন রাজাকে লড়াইয়ে হারিয়ে দিয়েছে, তিন বন্দিকে এনে ফেলে দিয়েছে লক্ষ্মণসেনের পায়ের ওপর, আরও কত কী। সব এখন তারা অরুণাশ্বর মুখ থেকে শুনতে চায়।

কী বলবে অরুণাশ্ব? তার দু'চোখ ছাপিয়ে শুধু গড়িয়ে আসছে জল। ভিক্ষু সুভদ্র ভুল বলেছিলেন। ভাল কাজ করলেও সবসময়ে তার প্রতিদান পাওয়া যায় না।

অনেককাল পরে রাতে বিছানায় শুয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদল অরুণাশ্ব, "মা মাগো, এ জীবনে আর তোমার সঙ্গে দেখা হল না।"

দিন যায়।

গ্রীষ্ম শেষ হয়ে বর্ষা নেমেছে মালঞ্চে।

মালঞ্চর বর্ষা সুবর্ণগ্রামের মতো অত ভয়ঙ্কর নয়। এখানে ঝড়ের পাগলা দাপাদাপি নেই, নদীর গোঁ গোঁ গর্জন নেই, মেঘনা ব্রহ্মপুত্রের দু'কূল ছাপানো বন্যা নেই। এখানে মেঘে ঢাকা আকাশ দিনভর ভারী দুঃখী হয়ে থাকে। বৃষ্টি ঝরে কান্নার মতো।

সেই সজল মেঘের দিকেই উদাস তাকিয়ে থাকে অরুণাশ্ব। তার জীবন আবার ফিরে গেছে বাঁধাধরা নিয়মে। সেই জল তোলা, কাঠ কাটা, উঠোন পরিষ্কার করা....। পরিবর্তন হয়েছে, তবে সামান্য। সন্ধেবেলা আজকাল অরুণাশ্বকে নিজের কাছে নিয়ে বসেন জীবদত্ত। গাছপালা চেনান, ওষুধ বিষুধ তৈরি করা শেখান। সেঁজুতির মা'ও আজকাল আর উঠতে বসতে খোঁটা দেন না। খাওয়া নিয়েও না।

boiRboi.net

গ্রামবাসীদের কাছেও অরুণাশ্বর দাম অনেক বেড়ে গেছে। তাদের চোখে অরুণাশ্ব এখন মস্ত বীর। এই সময়টায় মাঝে-মাঝে জঙ্গল থেকে বুনো জন্তু বেরিয়ে আসে। আগে সবাই দুদ্দাড়িয়ে পালাত। এখন অরুণাশ্বকে ডাকে। গ্রামের সকলে জেনে গেছে অরুণাশ্বর প্রাণের মায়া নেই।

নেই'ই তো। অরুণাশ্বর কাছে এখন বাঁচা মরা দুই'ই সমান।

আষাঢ় মাসটা বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে কেটে গেল। শ্রাবণের মাঝামাঝি এসে একটু বুঝি ধরল আকাশ। মেঘ আর রোদ্দুরের লুকোচুরি খেলা চলে সারা দিন। বেশ টের পাওয়া যায় এবার শরৎ আসছে।

দুপুরবেলা। খেয়ে উঠে দাওয়ায় বসে আপন মনে নিজের কাজ করছে অরুণাশ্ব। কাঁধে বসে আছে তার পায়রা। পাখিটা এখন ভালই উড়তে পারে। তবে বেশিদূর যায় না কখনও। ঘুরেফিরে অরুণাশ্বর কাছেই চলে আসে।

সেঁজুতি উঠোন থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে। সে কখনও দুপুরে ঘুমোয় না। মা চোখ বুজলেই ফুড়ুৎ করে ঘর থেকে পালিয়ে আসে।

"কী করছ গো রোমথাদাদা?"

অরুণাশ্ব চোখ তুলল, "এই ধুতিটা একটু রিফু করে নিচ্ছি।"

সামনে এল সেঁজুতি। হাতে আমের আচার, চাটছে। টকাস্ করে জিভে একটা শব্দ করে বলল, "এমা, এ যে একদম ছিঁড়ে গেছে গো!"

অরুণাশ্ব ছোট্ট শ্বাস ফেলল। তার মাত্র দুটিই কাপড়। পরনেরটি তাও চলনসই, এটি একেবারেই গেছে। ধান রোয়ার মরসুম এখন। কর্মকার কুম্ভকার তন্তুবায় সবাই এখন চাষে নেমে গেছে। তাঁতঘর বন্ধ, খুলবে সেই আশ্বিনে। সেই দুর্গাপুজোর সময়ে তাকে নতুন কাপড় কিনে দেবেন জীবদত্ত। ততদিন এটাকেই জোড়াতাপ্পি দিয়ে

BanglaBook.org

চালাতে হবে। উপায় কী!

সেঁজুতি দাওয়ায় কোণে এসে বসল, "আচার খাবে?"

"নাহ্।"

"খাও না একটু। ঝাল ঝাল। টক টক। মিষ্টি মিষ্টি। মা এটা খুব ভাল বানায়।"

"তুমি খাও। আমার ভাল লাগছে না।"

একটু বুঝি উন্মন হল সেঁজুতি, "সব সময়ে তুমি এরকম মন খারাপ করে থাকো কেন বলো তো?"

"মন খারাপ? কই, না তো।"

"বললেই হল? সেই যে তুমি যুদ্ধ জয় করে ফিরলে, তারপর একদিনও ভাল করে হেসেছ?"

"হাসি পায় না তো, কী করব!"

সেঁজুতি আচারটা ছুঁড়ে ফেলে দিল, "তুমি কেমন যেন হয়ে যাচ্ছ দিন দিন! হাঁড়িমুখো!"

অরুণাশ্ব উত্তর দিল না। কাজ করছে একমনে।

একটু চুপ থেকে সেঁজুতি আবার বকবক শুরু করল, "আমাদের বাড়ির কাউকে তোমার পছন্দ হয় না, তাই না রোমথাদাদা? বাবা, মা, আমি, কাউকে না।"

অরুণাশ্বর ঠোঁটের কোণে দুঃখী হাসির রেখা উঁকি দিয়েই মিলিয়ে গেল। কী উত্তর হয় এই কথার? তার কি পছন্দ অপছন্দর স্বাধীনতা আছে? সেঁজুতিকে যদি কখনও এমন বাবা-মাকে ছেড়ে দূর দেশে নির্বাসনে যেতে হয়, যদি সে বুঝতে পারে আর কোনওদিন আপনজনদের সঙ্গে দেখা হবে না, তা হলেই উত্তরটা খুঁজে পেয়ে যাবে সেঁজুতি।

সেঁজুতি দুলছে আপন মনে, "কী গো বলো, কাউকে পছন্দ নয়?"

অরুণাশ্ব উত্তর দেওয়ার আগেই বাইরে ঘোড়ার খুরের খটাখট শব্দ। প্রশ্ন ভুলে দৌড়ে গেছে সেঁজুতি।

হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরল, "ও রোমথাদাদা, কী কাণ্ড গো! কচিঠাকুরদাদা ঘোড়ায় চেপে এসেছে! কী সুন্দর সেজেছে গো কচিঠাকুরদাদা!"

অরুণাশ্ব ভীষণ অবাক হয়ে গেল। হাত থেকে সুচ সুতো খসে পড়েছে।

তখনই বৃকোদরের গলা শোনা গেল, "কই হে অরুণাশ্ব, গেলে কোথায়?"

বৃকোদরের পরনে দারুণ জমকালো পোশাক। মাথায় ঝলমল

করছে উষ্ণীষ। কোমরে তলোয়ার। নিরীহ পেটুক বামুনঠাকুর বলে তাকে আর চেনাই যায় না।

এক ঝলক বৃকোদরকে দেখে নিয়েই তীব্র অভিমানে মুখ ঘুরিয়ে নিল অরুণাশ্ব।

বৃকোদর চোখ কুঁচকে অরুণাশ্বকে দেখল, "সে কী গো? আমায় চিনতেই পারছ না?"

অরুণাশ্ব রা কাড়ল না। সে আর জন্মে কোনওদিন বৃকোদরের

boiRboi.net

সঙ্গে কথা বলবে না। এইসব রাজপুরুষদের তার চেনা হয়ে গেছে।

"রাগ হয়েছে বুঝি?" হা হা করে হাসল বৃকোদর। পরমুহূর্তেই গম্ভীর। সেঁজুতিকে বলল, "তোমার বাবাকে ডেকে দাও।"

ডাকতে হল না। জীবদত্তই গলা পেয়ে বেরিয়ে এসেছেন। একটু থমকে থেকে বললেন, "তুমি হঠাৎ? এই বেশে?"

বৃকোদর আরও গম্ভীর স্বরে বলল, "মহারাজের আদেশপত্র আছে আপনার জন্যে। পড়ুন।"

হতচকিত মুখে জীবদত্তর হাত থেকে রাজলিপিটি নিলেন জীবদত্ত। পড়তে পড়তে চোখ বড় বড় হয়ে যাচ্ছে। শেষ করে আবার পড়লেন। মুখ থেকে যেন বিস্ময় ঠিকরে এল, "অবিশ্বাস্য! ভাবা যায় না! এও কি সম্ভব?"

সেঁজুতি জিজ্ঞেস করল, "কী লেখা আছে ওতে, বাবা?"

"আজ থেকে তোমার রোমথাদাদা মুক্ত। মহারাজ বল্লালসেন অরুণাশ্বকে সব অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। তার সাজাও মকুব হয়ে গেছে।"

অরুণাশ্বর মাথা ঘুরছে। টলতে টলতে নেমে এল দাওয়া থেকে। উঠোনের মাঝখানে এসে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

boiboi.net

জীবদত্তর কবিরাজখানায় বসে কথা হচ্ছিল। এখনও সন্ধ্যা নামেনি। তার আগেই বড় দীপাধারে আলো জ্বালিয়ে দিয়েছেন সেঁজুতির মা। ঝলমল করছে গোটা ঘর।

জীবদত্ত প্রশ্ন করলেন, "এই অসাধ্য কে সাধন করল বৃকোদর?"

"নিজের মুখে নিজের নাম কী করে বলি!" বৃকোদর লজ্জা পেল, "আজ্ঞে, আমি।"

"কিন্তু কী করে?"

"সে এক দীর্ঘ কাহিনী।" হাত পা ছড়িয়ে মজলিসি ভঙ্গিতে বসল বৃকোদর, "আমার তো প্রথম থেকেই সন্দেহ হয়েছিল, অরুণাশ্বর মতো ভাল ছেলে কখনও তার বাবাকে মারতে পারে না। যুবরাজ লক্ষ্মণসেনকে বললাম সে-কথা। শুনে যুবরাজ বললেন, তুমি তোমার কথা প্রমাণ করতে পারবে? আমি জেদের বশে বললাম, নিশ্চয়ই পারব। আপনি শুধু আমাকে চারটে সৈনিক দিন, যারা আমার হুকুম পেলেই অপরাধীকে বন্দি করতে পারে। ব্যস্, চার সৈন্য নিয়ে কর্ণসুবর্ণ থেকে নৌকোয় চড়ে বসলাম, নামলাম গিয়ে সেই সুবর্ণগ্রামে। তা ওই সময়ে তো বর্ষা নামছে। সামলে সুমলে পৌঁছতে পাঁচদিন লেগে গেল। পৌঁছে পুরো দিনেরবেলাটা নৌকোতেই ঘাপটি মেরে বসে রইলাম। তারপর যেই না রাত হয়েছে, অমনই আমার চার সঙ্গীকে নিয়ে রওনা দিলাম অরুণাশ্বদের বাড়ির দিকে।"

সেঁজুতির চোখ গোল গোল, "কেন, রাতের বেলা কেন?"

"কারণ আছে। কারণ রাতের বেলাতেই মানুষ ভূতের ভয় পায়। আর ভয় পেলেই মানুষের পেট থেকে সত্যিটা বেরিয়ে আসে।"

জীবদত্ত বিড়বিড় করে উঠলেন, "বুঝলাম না।"

"বুঝবেন কী করে? আপনারা সরল সাদাসিধে মানুষ। আর এ হল গিয়ে যাকে বলে কূটকৌশল।...মনে আছে, এক সময় মালঞ্চ গ্রামে রোজ ভূত বেরোত? অরুণাশ্বকে জিজ্ঞেস করুন সে-ভূত কে ছিল? আমি। ইয়া বড় বড় লাঠি, যাকে বলে রনপা, পরে ঘুরে বেড়াতাম, লোক ভূত ভেবে সিঁটিয়ে থাকত।"

অরুণাশ্ব এখন সুস্থ। স্বাভাবিক। তবে তার চোখ থেকে এখনও

বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি। জীবদত্তর দিকে চেয়ে আলগা ঘাড় নাড়ল সে। হ্যাঁ, এ কাহিনী তার অজানা নয়। আগে বলেনি, কারণ বৃকোদরকে নিয়ে কথা বলতে তার প্রবৃত্তি হয়নি।

"হ্যাঁ, তারপর হল কি..." বৃকোদর আবার শুরু করল, "অরুণাশ্বদের বাড়ির পেছন ভাগে সৈন্যদের দাঁড় করিয়ে রেখে ওদের বাগানে তো ঢুকেছি...ঢুকেই রনপা-জোড়া পরে নিলাম। তারপর তক্কে তক্কে আছি, ওদের বাড়ি থেকে কেউ বেরোয় কি না।

অপেক্ষা করছি, অপেক্ষা করছি... প্রায় মাঝরাত নাগাদ একজনের দেখা পাওয়া গেল। অমনই নাকি সুরে ডাক ছাড়লাম, এঁই তুঁই কেঁ রেঁ? সে ব্যাটা কাঁপতে কাঁপতে পড়ে যায় আর কী। কোনওরকমে বলল, আজ্ঞে আমি গোষ্ঠক। নামটা আমার শোনাই ছিল, অমনি এক চাল চাললাম। বললাম, আঁমায় চিঁনতে পাঁরিস? আঁমি তোঁর প্রঁভু, জঁয়ানন্দ বঁণিক। বেঁঘোরে প্রাঁণ হাঁরিয়ে আঁমার আঁত্মা এঁখনও ছঁটফট কঁরছে। ব্যাটা সঙ্গে সঙ্গে পায়ে লুটিয়ে পড়েছে। আমি আবার নাকি সুরে বললাম, আমার শুধু জানতে ইচ্ছে করছে, আমি তোকে এত ভালবাসতাম, তবু তুই আমার বুকে ছুরি বসিয়ে দিলি? কেন রে বাবা? আমার ভাল ছেলেটাকে ধরিয়ে দিয়েই বা তোর কী লাভ হল? সব কথা না জানতে পারলে আমার আত্মার সদ্‌গতি হবে না। গোষ্ঠক হাউমাউ করে কেঁদে উঠল, আমি আপনার বুকে ছুরি বসাইনি প্রভু। আমি শুধু পেছন থেকে আপনার মাথায় আঘাত করেছিলাম। ছুরি বসিয়েছিল পাচক বল্লভ।"

অরুণাশ্ব হতবুদ্ধি মুখে বলে উঠল, "গোষ্ঠক বলল এ-কথা? বলল? সে, বল্লভ, সবাই তো আমার বাবাকে ভীষণ ভালবাসত! সে হত্যাকারী? কেন?"

"রোসো, রোসো।" বৃকোদর চোখ ঘোরাল, "আরও আছে। আমি তো ছাড়ার পাত্র নই। আমি বললাম, বল্লভ আমাকে খামোকা

মারতে যাবে কেন? তা সে বলল, আজ্ঞে বল্লভও স্বেচ্ছায় করেনি। উৎকোচের লোভে রাজি হয়েছে। আসল নাটের গুরু থেকে গেছেন পরদার আড়ালে। আপনাকে হত্যার সময়ে তিনি সুবর্ণগ্রামের ত্রিসীমানায় ছিলেন না।"

"কে? কে সে?" অরুণাশ্বর জিভ শুকিয়ে গেল।

"যাঁকে আমার গোড়া থেকে সন্দেহ, তিনিই, আবার কে! তোমার কাকা।"

অরুণাশ্ব পাথর হয়ে গেল। মনের কোণের ক্ষীণ সংশয়টিই সত্যি হল?

বৃকোদর বলল, "ব্যস, আমার কাজও হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে সৈনিক পাঠিয়ে বল্লভ আর গোষ্ঠক দু'জনকেই বন্দি করে ফেললাম। শুধু নয়নাগকে তক্ষুনি পেলাম না। তিনি তখন বিক্রমপুরে গিয়ে বসেছিলেন। পরদিন সকালেই নৌকোয় যাত্রা শুরু করে পৌঁছে গেলাম বিক্রমপুর। নয়নাগকেও ধরে এনে ফেললাম মহারাজের পায়ের কাছে। নয়নাগ প্রথমে না না করছিলেন। গোষ্ঠক আর বল্লভ সমস্ত স্বীকার করেছে শুনে সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়লেন। তখনই তো জানা গেল পাশার জুয়া খেলতে গিয়ে দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা হেরেছিলেন তোমার কাকা। অত স্বর্ণমুদ্রা পরিশোধের ক্ষমতা ছিল না নয়নাগের। দাদার কাছে গিয়ে চেয়েছিলেন। জয়ানন্দ দিতে চাননি। উল্টে বলেছিলেন, জুয়ার অভ্যেস না ছাড়লে নয়নাগকে তিনি সম্পত্তির ভাগ দেবেন না। তাই চক্রান্ত করে, দাদাকে হত্যা করে, তাঁর সব সম্পত্তি...। খঞ্জরখানা নিজেই বল্লভের হাতে তুলে দিয়েছিলেন নয়নাগ। অরুণাশ্বকে না ধরিয়ে দিলে পুরো সম্পত্তি পাবেন না, তাই ওই নিষ্পাপ ছেলেটিকে বলির পাঁঠা করেছিলেন তিনি।"

অরুণাশ্বর চোখ জ্বলছিল। অর্থের লালসা মানুষকে এত নীচে

নামিয়ে দেয়? দেবতার মতো দাদাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে এতটুকু বুক কাঁপল না কাকার?

ফ্যাঁসফেসে গলায় অরুণাশ্ব জিজ্ঞেস করল, "আর মা? আমার মা কোথায়? তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি বামুনঠাকুর?"

"হয়েছে।" বৃকোদরের তুবড়ি ছেটানো মুখে যেন ছায়া ঘনাল, "তিনি খুব ভাল নেই অরুণাশ্ব। একেবারে বুড়িয়ে গেছেন। তোমাদের বাড়ির নীচের একটা ঘরে থাকতেন তিনি। প্রায় বন্দি হয়ে। দেখে মনে হল, ভাল করে খাওয়াও জুটত না। আমার মুখে তোমার সংবাদ শুনে বুক চাপড়ে কাঁদছিলেন।... শান্তি পাবেন নয়নাগ। মহারাজা বল্লালসেন নয়নাগকে মাটিতে জীবন্ত পুঁতে দেওয়ার আদেশ দেবেন।"

গোটা ঘর নীরব। অরুণাশ্বও আর কথা বলতে পারছে না। মুক্তির আনন্দে অদ্ভুত এক শিহরন জাগছে শরীরে। আবার বিচিত্র এক কষ্টও হচ্ছে। প্রিয় মানুষ পশুর চেয়েও খারাপ আচরণ করলে বুঝি এমন অনুভূতিই জাগে। কাকা তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলে কাকিমা বা কাকার ছেলের সঙ্গে কখনও খারাপ আচরণ করবে না অরুণাশ্ব। এখন থেকে সে-ই তো হবে সংসারের কর্তা। সকলের ভাল-মন্দ তো এখন তারই হাতে। ভালবাসা দিয়ে কাছে টানতে হবে সকলকে।

বেশ খানিকক্ষণ পর জীবদত্ত কথা বললেন, "কিন্তু বৃকোদর, তুমি যে বাপু এত কিছু করলে, শুনেছি কজঙ্গল চম্পা অপরমন্দারের সামন্তদের ধরানোর পেছনে তোমারই মগজ ছিল। তা তোমার কী পদোন্নতি হল বাবা?"

বৃকোদর লাজুক হেসে বলল, "আমার দুটো লাভ হয়েছে। আমার রনপা চড়ার গল্প শুনে মহারাজা বল্লালসেন চরদের একটা নতুন বাহিনী তৈরি করছেন। যারা ওই রনপা চড়েই খবর

দেওয়া-নেওয়া করবে। আমাকেই গড়ে তুলতে হবে সেই বাহিনী। আর পদোন্নতিও একটা হয়েছে বটে। আমার জন্য একটা নতুন পদ তৈরি করেছেন মহারাজা। পদটির নাম দৌঃসাধ্য-সাধনিক।"

"অর্থাৎ কিনা যে দুঃসাধ্য সাধন করবে, তাই তো?" জীবদত্ত বললেন।

"ঠিক তাই। তৃতীয় একটা লাভও হয়েছে।" বৃকোদরের গালের হাসি চওড়া হল, "সেটা হল, আমাদের এই সোনা ছেলেটার মনের দুঃখ ঘোচাতে পেরেছি। কী হে অরুণাশ্ব, এবার একটু হাসো।"

অরুণাশ্বর মুখে মেঘহীন আকাশের হাসি। বহুকাল পর। খুশি খুশি মুখে বলল, "কিন্তু একটা কথা কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না বামুনঠাকুর। আমাকে বাঁচানোর আপনার কী দায় ছিল?"

"ছিল। মহারানি রামদেবীর আজ্ঞা। মহারানির মনে কেমন যেন বিশ্বাস জন্মেছিল তুমি নিরপরাধ। আমাকে তিনি তাই সত্য উদ্‌ঘাটনের ভার দিয়েছিলেন। এ-কথা অবশ্য মহামন্ত্রী ছাড়া আর কেউ জানতেন না। মহারাজা বল্লালসেনও না।"

অরুণাশ্ব একপল নীরব। মহারানি রামদেবীর মুখটা মনে পড়ল। করুণামাখা এক মাতৃমূর্তি। আমতা আমতা করে বলল, "তাই যদি হবে, তা হলে সেদিন যুবরাজের শিবির থেকে আমায় অমন দূর দূর করে তাড়ালেন কেন?"

"হেঁ হেঁ, ওটিও একটি কূটকৌশল।" বৃকোদর অরুণাশ্বর পিঠে আলগা চাপড় দিল, "মনে পড়ে, তুমি একদিন আমায় বলেছিলে নয়নাগ হলায়ুধ মিশ্রের বন্ধু? কথাটা আমি ভুলিনি। আমার চরদের কাছ থেকে খবর নিয়ে জানলাম নয়নাগ শুধু হলায়ুধ মিশ্রেরই অনুচর নন, তিনি যুবরানি বল্লভার ভাই কুমারদত্তরও অতি ঘনিষ্ঠ মিত্র। এবং লক্ষ্মণসেনেরও যথেষ্ট পরিচিত। তক্ষুনি তক্ষুনি নয়নাগের কথা তুললে যুবরাজ অস্বস্তিতে পড়ে যেতেন। তুমি

বাচ্চা ছেলে, তুমি রাজারাজড়াদের চেনো না। তাঁরা কখন খুশি হন, কখন রেগে যান, তা বোঝা শিবেরও অসাধ্য। হলায়ুধ কুমারদত্তরা যুবরাজের অত কাছের লোক, অভিযোগ শুনে তাঁর যদি মনে হত বন্ধুদের অপমান করা হচ্ছে, তা হলে আমার গোটা পরিকল্পনাটাই কেঁচে যেত। বরং ওই যে তোমাকে কিছু দেওয়া হল না, তাতে যুবরাজের মন খুঁতখুঁত করতে লাগল। আর আমিও সুযোগ বুঝে কথাটা বলে ফেললাম। কী, এবার বুঝলে?"

গল্পগুজবে রাতটা কেটে গেল।

এবার অরুণাশ্বর রওনা হওয়ার পালা।

বেলা বাড়তে বৃকোদরের সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল অরুণাশ্ব। সজল চোখে তাঁকে বিদায় দিচ্ছেন জীবদত্ত। গ্রামবাসীরাও খবর পেয়ে জড়ো হয়েছে। প্রিয় রোমথাকে ছেড়ে দিতে তাদেরও চোখে জল।

সেঁজুতি ছলছল চোখে বাবা মা-র পেছনে দাঁড়িয়ে। তার হাতে অরুণাশ্বর সাদা পায়রাটা।

অরুণাশ্বর বুক টনটন করে উঠল। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসা পাখিটাকে কি নিয়ে যাবে সঙ্গে করে? না। ও পাখির এখন ডানার জোর এসে গেছে, ও বরং নীল আকাশেই স্বাধীনভাবে ডানা মেলুক।

boiRboi.net

ধুলো উড়িয়ে ঘোড়া মালঞ্চ গ্রাম ছাড়ল।

দু' ধারে সবুজ ধানখেত। কচি ধানগাছ দুলছে নরম হাওয়ায়। দিঘি পুকুর খানাখন্দ সবই এখন জলে ভরপুর, এদিকের রুখুসুখু ভাবটা এখন একদম নেই। অরুণাশ্বর চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছিল।

যেতে যেতে বৃকোদর বলল, "তা ভাই অরুণাশ্ব, এখন কী করবে মনস্থ করলে?"

আনমনে অরুণাশ্ব বলল, "দেখি।...আগে বাড়ি তো পৌঁছই।"

"কাজের কথা শোনো। তোমার বীরত্ব মহারাজা বল্লালসেনকে মুগ্ধ করেছে। তিনি তোমাকে তাঁর অশ্বারোহী বাহিনীতে নিতে চান। যুবরাজেরও সেরকমই ইচ্ছে। জানোই তো, যুবরাজ গৌড় আক্রমণের তোড়জোড় করছেন। বৃষ্টিবাদলা পুরোপুরি থামলেই তিনি বেরিয়ে পড়বেন। যদি চাও তো একদম যুবরাজের পাশে পাশে থাকতে পারো। যুবরাজের আরোহক, অর্থাৎ কিনা অশ্বারোহী দেহরক্ষক হয়ে।"

অরুণাশ্বর চোখ উজ্জ্বল হয়েও নিভে গেল। একটু ভেবে নিয়ে বলল, "না বামুনঠাকুর, আমার রাজপদের আকাঙ্ক্ষা নেই। সত্যি বলতে কী, যুদ্ধবিগ্রহ আমার একটুও ভাল লাগে না। আমি বণিকের ছেলে, বাবার ব্যবসা-বাণিজ্যই দেখব।"

"ভেবে দ্যাখো। তোমার ওপর মহারানি রামদেবীর কৃপাদৃষ্টি আছে। তুমি কিন্তু চড়চড় করে উন্নতি করতে পারবে।"

"আমি ওই উন্নতি চাই না বামুনঠাকুর। আমি মা'র কাছে থাকতে চাই। বাড়ি ফিরে শান্তির জীবন চাই। আবার মেঘনার তীরে বসে বাঁশি বাজাব, জ্যোৎস্না রাতে নৌকো বাইব, আর ব্যবসার কাজে ঘুরে বেড়াব দেশদেশান্তরে। ওতেই আমার সুখ।"

কথা বলতে বলতেই কল্পচোখে সুবর্ণগ্রামের বাড়িটাকে দেখতে পাচ্ছিল অরুণাশ্ব। ওই তো দালানে দাঁড়িয়ে আছেন মা। শীর্ণ, দুঃখিনী, সাদা হয়ে গেছে চুল। দু' হাত বাড়িয়ে অরুণাশ্বকে ডাকছেন তিনি।

অরুণাশ্ব ফিসফিস করে বাতাসকে শোনাল, "মা, আমি ফিরছি।"

বই নং
তারিখ
ফোন

উপসংহার

তিন মহাসামন্ত প্রতিশ্রুতি মতো অর্থ আর সৈন্য পাঠিয়েছেন যুবরাজ লক্ষ্মণসেনকে। শরতের শেষাশেষি বীরবিক্রমে গৌড় অভিমুখে যাত্রা করলেন যুবরাজ। গৌড়েশ্বর গোবিন্দপালকে হারিয়েই তিনি থামলেন না, তাঁকে ধাওয়া করে চললেন মিথিলার পথে। সেখানেও জিতলেন তিনি, গাহড়ওয়াল রাজাকে নাস্তানাবুদ করে দিলেন।

পাটলিপুত্র অবধি মহারাজা বল্লালসেনের রাজত্ব ছড়িয়ে পড়ল। গৌড়েশ্বর হয়েছেন তিনি, সাধ মিটেছে তাঁর।

কিন্তু সে অন্য গল্প। রাজরাজড়াদের যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী।

রোমথা অরুণাশ্ব ঘরে ফিরল, আমাদের গল্পের নটেগাছটি মুড়োল।

boiRboi.net

অর্কপ্রভ দত্তগুপ্ত
বই নং 732
তারিখ 07 MAY 2009
ফোন
অরুনেন্দু ভবন, শিলিগুড়ি